পড়াশোনার ক্রোড়পত্র

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ২৭ ডিসেম্বর ২০১৬

উত্তরণ

৮ পাতার এই রঙিন ক্রোড়পত্রটি যুগশঙ্খ-র সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরিত

শরীরচর্চা ও শিক্ষা

আজকের শৈশব মানে বইয়ের ভারে ঝুঁকে থাকা। হোমওয়ার্ক, ইউনিট টেস্ট আর সারপ্রাইজ টেস্ট-এ নাজেহাল। পুরোদিন মুখ গুঁজে পড়া নয়তো পড়ার মতো করেই আঁকা বা গান গাওয়া বা নাচ করা। টেনশন, ভয়, প্রতিযোগিতার চাপে দিশাহারা। এরমধ্যে আমরা ভুলে যাই শরীরকে— যাকে ছাড়া শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য যে মানব মনের বিকাশ-সেই উদ্দেশ্য আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি। বর্তমানে আমাদের সংস্কৃতিতেও বেশি মাত্রায় টিভি ও কম্পিউটার-এর ব্যবহার শুরু হয়েছে, যা ছোটবেলা থেকেই বসে থাকার প্রবণতা বাড়িয়ে দিচ্ছে। এ প্রবণতা যে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, তা শরীরতত্ত্ববিদ সবসময়ে বলছেন। অবশ্য এ প্রবণতা যে সব সময় প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে বাড়ছে তা নয়; অন্য কিছু করতে না পারার জন্যও বাড়ছে বটে। পড়াশোনার কাজেও কম্পিউটার, ইন্টারনেট ছাড়া আজকে একটা দিনও চলা সম্ভব না। কিন্তু মনে রাখতে হবে শিক্ষার্থীদের বিকাশধারার বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ করে দেওয়া দরকার। এই লক্ষ্যে মাঠে খেলাধুলো একটা ভালো বিকল্প। প্লেটো তাঁর 'রিপাবলিক' বইতে বলেছেন, জিমন্যাসটিক্স এবং সংগীত শিশু বয়স থেকেই শুরু হওয়া উচিত; এই প্রশিক্ষণ সযত্নে হওয়া উচিত এবং সারাজীবন ধরে চলা উচিত। তিনি অবশ্য বলেছেন যে, এই প্রশিক্ষণ পেশাগত ক্রীড়াবিদদের মতো হবে না, হবে কিছুটা পরিশীলিত ধরনের; যা শিক্ষার্থীর সুস্বাস্থ্য গঠনে সাহায্য করবে এবং চোখ ও কানকে তীক্ষ্ণ করবে।

বর্তমান শতাব্দীতে চারটি সুস্বাস্থ্যের মানদণ্ড আছে। তা হল: শরীরের সুস্বাস্থ্য, মানসিক সুস্বাস্থ্য, সমাজের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ সুস্বাস্থ্য আর নৈতিক সুস্বাস্থ্য। যখন শারীরিক বিকাশের ক্ষেত্রে রোগহীন সুষম স্বাস্থ্য গঠিত হবে। মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে- জ্ঞানের আহরণ ও বিভিন্ন মানসিক শক্তির পূর্ণ বিকাশ ঘটবে; আবেগিক ক্ষেত্রে সুসমন্বিত আবেগ প্রকাশের বা আবেগকে বশে রাখার যোগ্যতা জন্মাবে; সামাজিক ক্ষেত্রে সামাজিক ও নাগরিক যোগ্যতার পূর্ণ বিকাশ ঘটবে; নৈতিক ক্ষেত্রে সমাজে প্রতিষ্ঠিত নৈতিক মানের ও সুষম জীবনদর্শনের বিকাশ ঘটবে-তখনই কোনও মানুষ সম্বন্ধে বলা যাবে—'মানুষের মতো মানুষ হয়েছে'। মানসিক সুস্বাস্থ্যের অর্থ পরিবার পরিজন, সমাজের কোনও ব্যক্তি ও দলের সঙ্গে মিলেমিশে থাকা, যেমন নিজেকে তেমনি অন্যদের পছন্দ করাই মানসিক সুস্বাস্থ্য। শরীরের সুস্বাস্থ্য ও মানসিক সুস্বাস্থ্য আবার একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, শরীরের সুস্বাস্থ্য মানসিক সুস্বাস্থ্য গড়ে।

যেসব ছেলেমেয়ে নিয়মিত খেলাধুলা কিংবা শরীরচর্চা করে সময় কাটায় পুঁথিগত শিক্ষায় তারা ভালো নয়, অন্যদের থেকে পিছিয়ে পড়ে— প্রচলিত এই ধারণাটি ঠিক নয়। কেননা নতুন গবেষণায় বলা হচ্ছে ঠিক উল্টো কথা। সুস্থ ও সবল এবং খেলাধুলাপ্রিয় ছেলেমেয়েরাই পুঁথিগত শিক্ষায় ভালো করে থাকে। অঙ্কে তো অন্যদের পেছনে ফেলছে তারা অহরহ। তাদের মনোযোগও বেশি। যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি স্কুলের ছেলেমেয়ের গণিত ও অন্যান্য পরীক্ষার খাতা বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, শারীরিকভাবে দুর্বল ছেলেমেয়ের চেয়ে সুস্থ ও সবলদের গণিতে পাস করার হার ২.৪ ও অন্যান্য বিষয়ে ২.২ গুণ বেশি। যেভাবেই দেখা হোক না কেন, আক্ষরিক অর্থেই শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য একই সুতোয় গাঁথা।

এরপর শেষের পাতায়

দুইয়ের পাতায়
ক্লাস সিক্স-এর টিউশন
ভূগোল
ইংরেজি

তিনের পাতায়
ক্লাস সেভেন-এর টিউশন
বিজ্ঞান
ইতিহাস

চারের পাতায়
ক্লাস এইট-এর টিউশন
বাংলা
ভূগোল

পাঁচের পাতায়
ক্লাস নাইন-এর টিউশন
ইংরেজি
ভৌতবিজ্ঞান

ছয়ের পাতায়
ক্লাস টেন-এর টিউশন
ইতিহাস
জীবন বিজ্ঞান

সাতের পাতায়
কম্পিউটার
এডু টিপস

আটের পাতায়
হেল্‌থ টিপস

শিক্ষাগুরুর পরামর্শ

পাঠ্যবই খুঁটিয়ে পড়তে হবে

ড. রাখি মুখোপাধ্যায়
কৃষ্ণনগর রাষ্ট্রীয় উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

সামনেই মাধ্যমিক পরীক্ষা। পরীক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে মূলত একটাই কথা বলবার যে, তাদের মনে রাখতে হবে যে সারা বছরে তাদের প্রতিটা বিষয় পড়ে খাতায় লিখে গুছিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। এখন শুধু রিভাইস করে যেতে হবে।

এখনকার সিলেবাস অনুযায়ী প্রশ্নপত্রে বেশির ভাগ অবজেকটিভ প্রশ্নই থাকবে। তাই পাঠ্যবইগুলো খুঁটিয়ে পড়তে হবে। তাহলেই দেখবে প্রশ্নপত্র আর কঠিন মনে হবে না। আর পড়ার সঙ্গে লেখাও অভ্যেস করতে হবে। মনে রাখতে হবে লেখার মধ্যে দিয়েই তাদের মূল্যায়ন হবে।

কেউ যদি দিনে পাঁচ ঘণ্টা পড়াশোনা করে তো অন্তত এক ঘণ্টা লেখার জন্যে রাখতে হবে। আজকে যেটা পড়লে সেটা তক্ষুনি লিখলে মনে থাকতেই পারে। তাই পরের দিন না দেখে লিখে দেখা উচিত যে কেমন মনে আছে।

ছাত্রছাত্রীদের নিজেদেরই নিজেদের পরীক্ষক হতে হবে। যা লেখা হল তা নিজেকেই মিলিয়ে দেখতে হবে যে সে কী ভুল করছে। খাতা দেখে প্রশ্ন বলে স্কেল চাপা দিয়ে না দেখে উত্তর বলা যেতে পারে। এভাবে বারে বারে একই বিষয় ঝালিয়ে নেওয়া যেতে পারে। সময়মতো পড়া তৈরি করা থাকলে পরীক্ষার সময়ে আর কোনওরকম ভয়ের বিষয় থাকবে না।

শেষে আমি বলব যে, সব ছাত্রছাত্রী যেন সুস্থভাবে তাদের পরীক্ষাগুলো দিতে পারে এই শুভকামনাই আমি একজন শিক্ষিকা হিসাবে করি।

'উত্তরণ'-এর মুখোমুখি | রোল নং ওয়ান

প্রতিদিন দু'ঘণ্টা করে অঙ্ক প্র্যাকটিস করি

তমোঘ্ন শীল অষ্টম শ্রেণি,
দ্য পার্ক ইনস্টিটিউশন, শ্যামবাজার

তমোঘ্ন পড়াশোনায় বেশ ভালো। সারাদিন শুধু পড়াশোনা নিয়ে থাকে, এমনটা নয়। কিন্তু যতটুকু সময় পড়ে মন দিয়ে পড়ে। পড়াশোনার মতো খেলাধুলাতেও যথেষ্ট আগ্রহ রয়েছে তমোঘ্নর। স্কুল থেকে ফিরে একটু খেলা চাই। তা না হলে পড়াশোনায় তার মন বসে না। তবে সেটা নির্ধারিত সময়ের জন্য। তারপর ঘরে এসে একটু বিশ্রাম নিয়ে পড়তে বসে। তমোঘ্নর আরও একটি গুণ হল সে নিজের হাতে নানারকম জিনিস তৈরি করতে খুব ভালোবাসে। সময় পেলেই নানান রকম হাতের কাজ তৈরি করে। ক্লাস ফাইভ থেকে প্রথম স্থান ধরে রেখেছে। তার জন্য কীভাবে পড়াশোনা করে, পরীক্ষার আগে কীভাবে নিজেকে তৈরি করে জানাল, 'উত্তরণ'-কে।

উত্তরণ: নতুন ক্লাসে উঠলে, কেমন লাগছে?

তমোঘ্ন: ভালোই লাগছে। তবে পড়ার চাপ আরও বাড়বে। আরও মন দিয়ে ভালো করে পড়াশোনা করতে হবে।

উত্তরণ: সারাবছর কীভাবে, কতক্ষণ পড়াশোনা কর?

তমোঘ্ন: সকালে ঘুম থেকে উঠে তিনঘণ্টা পড়ি। তারপর স্কুলে যাই। স্কুল থেকে ফিরে একটু খেলি। তারপর ঘরে এসে একটু বিশ্রাম নিয়ে পড়তে বসি। ছ'টা থেকে দশটা পর্যন্ত পড়ি।

উত্তরণ: পড়তে পড়তে একঘেয়ে লাগলে কী কর?

তমোঘ্ন: গল্পের বই পড়ি।

উত্তরণ: পরীক্ষার আগে কীভাবে প্রস্তুতি নাও?

তমোঘ্ন: স্যার, ম্যাডামরা বলেন স্কুলের বইটা ভালো করে পড়তে। তাই স্কুলের বইগুলো ভালো করে পড়ি। কিছু বুঝতে অসুবিধা হলে টিচারদের থেকে বুঝে নিই।

উত্তরণ: কোনও পড়া মনে রাখতে না পারলে কী কর?

তমোঘ্ন: পড়ার পর সেটা না দেখে বারবার লিখি। তারপর মনে থাকে।

উত্তরণ: কোচিংয়ে পড়ো?

তমোঘ্ন: হ্যাঁ, শুধু ইংরেজিটা কোচিংয়ে পড়ি। বাকি বিষয়গুলো বাড়িতেই পড়ি।

উত্তরণ: দিনে কতক্ষণ অঙ্ক প্র্যাকটিস কর?

তমোঘ্ন: প্রতিদিন দু'ঘণ্টা করে অঙ্ক করি।

উত্তরণ: বড় হয়ে কী হতে চাও?

তমোঘ্ন: আমার খুব ইচ্ছা বড় হয়ে ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার। তাই এখন ভালো করে পড়াশোনা করতে চাই।

উত্তরণ: জীবনে অনেক বড় হও। শুভেচ্ছা রইল।

উত্তরণ
যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ২৭ ডিসেম্বর ২০১৬

স্মরণীয় যাঁরা
(২৭ ডিসেম্বর - ২ জানুয়ারি)

স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং অগ্নিযুগের বিপ্লবী

ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত

(জন্ম: ৮ অক্টোবর ১৮৯৪, **মৃত্যু: ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৭৯**)

তিনি যশোর জেলার ঠাকুরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ছিলেন কৈলাশ চন্দ্র দত্ত এবং মাতা বিমলাসুন্দরী দেবী।
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর তিনি জার্মান অস্ত্রের সাহায্যে ভারতে বিপ্লবী অভ্যুত্থান ঘটানোর প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ১৯১৭ সালে তিনি ধরা পড়ে যান। বিলাশপুর জেলে প্রেরিত হয়েছিলেন। সেখানে আটাত্তর দিন নিঃসঙ্গ অবস্থায় অনশন করেন। তাকে বার্মার জেলে পাঠানো হয়। ১৯২০ সালে ছাড়া পাবার পরে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। এক সময় তিনি সাপ্তাহিক স্বাধীনতা পত্রিকা সম্পাদনা করেন।

লিখেছেন: **প্রতাপচন্দ্র সাহা**
(শিক্ষক, মুড়াগাছা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়)

TEAM উত্তরণ

শর্মিলা চন্দ্র
(কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর)

তনুশ্রী দাস | সালমা আহমেদ
বিদিশা রায়চৌধুরী (গুয়াহাটি)
এনায়তি দেবদত্ত (শিলচর)

ক্লাস সিক্স-এর টিউশন | ভূগোল

বায়ুদূষণ

বর্তমান যুগে দূষণ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। আমাদের চারপাশের পরিবেশ বিভিন্ন কারণে দূষিত হচ্ছে এবং দূষণের ফলে মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তুর মধ্যে নানা ধরনের রোগের জন্ম হচ্ছে। মানুষের গড় আয়ু কমে যাচ্ছে।

বায়ুদূষণ: বিভিন্ন প্রকার বিষাক্ত গ্যাস (যেমন— কার্বন-ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, সালফার-ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি) রাসায়নিক পদার্থ (যেমন, সিসা, ক্লোরোফ্লুরো কার্বন) যানবাহনের ধোঁয়া, ধূলিকণা, জৈবপদার্থ দ্বারা দূষিত হয়।

কারণ: পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা বাড়ার সাথে ঘরবাড়ি, অফিস, কলকারখানা তৈরি করার জন্য বহু গাছপালা, বনজঙ্গল কেটে ফেলা হচ্ছে। ফলে বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে চলেছে।

মানুষের চাহিদা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা পৃথিবীতে কলকারখানা, শিল্পকেন্দ্র, তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র গড়ে উঠছে। এইসব জায়গা থেকে প্রচুর পরিমাণে কার্বনের গুঁড়ো, ধোঁয়া, ও ধূলিকণা, কার্বন মনোক্সাইড, সালফার-ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড নির্গত হয়, যা বাতাসে মিশে বাতাসকে দূষিত করে।

চাষের জমি থেকে রাসায়নিক সার, কীট-নাশকের গুঁড়ো, আবর্জনা, খড়কুটো পোড়ানো ছাই, ধূলিকণা প্রভৃতি বাতাসকে দূষিত করে।

গাড়ির সংখ্যা দিন দিন বাড়ার ফলে বায়ু দূষিত হচ্ছে। কারণ বাস, লরি, জাহাজ, এরোপ্লেন এগুলিতে প্রচুর পরিমাণে পেট্রোল, ডিজেল, গ্যাসোলিন ইত্যাদি পোড়ানো হয়। ফলে প্রচুর কার্বন মনোক্সাইড, সিসা বাতাসে মেশে।

এছাড়াও রান্নার জন্য ব্যবহৃত কাঠ, ঘুঁটে, কয়লা, গ্যাস থেকে প্রচুর ধোঁয়া, কার্বনকণা, বেশ কিছু ক্ষতিকারক গ্যাস বাতাসে মেশে। এছাড়া ঘরের আবর্জনা, জঞ্জাল, ধূপকাঠি, বিভিন্ন জীবাণুনাশক রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি থেকেও বাতাস দূষিত হয়।

ঘরের দরজা, দেওয়ালে যে রং করা হয় তার থেকেও অনেক সময় দূষণ ছড়ায়।

সিগারেট, বিড়ির ধোঁয়া আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে সবচেয়ে মারাত্মক। ধূমপান থেকে ঘরের বাতাসে সবথেকে বেশি দূষণ ছড়ায় এবং এর থেকে হৃৎপিণ্ড, ফুসফুসের সমস্যা, ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

আমাদের চারপাশের বাতাসে প্রচুর ধূলিকণা মিশে থাকে তা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে দিয়ে শরীরে ঢোকে এবং শরীরের ক্ষতি করে। তবে এই বায়ুদূষণের হাত থেকে প্রতিকারের জন্য কিছু উপায় অবলম্বন করা যায়, সেগুলি হল—

ঘরের জানালা, দরজা খুলে উনুন, গ্যাস ধরাতে হবে যাতে ধোঁয়া বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে।

হাঁচি বা কাশির সময় সবসময় মুখে রুমাল চাপা দেওয়া উচিত।

মশার ধূপ না জ্বালিয়ে মশারি ব্যবহার করলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হবে না।

ঘরে বাইরের আবর্জনা সবসময় ঢেকে রাখা উচিত।

ফলাফল:

গ্রিনহাউস: পৃথিবীতে সূর্য থেকে আগত তাপ রাতে মহাশূন্যে ফিরে যায়। কিন্তু বাতাসে থাকা জলীয় বাষ্প, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড প্রভৃতি গ্রিনহাউস গ্যাসগুলি এই ফিরে যাওয়া তাপ কিছুটা শোষণ করে। ফলে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বাড়তে থাকে।

অ্যাসিড বৃষ্টি: যানবাহন, কলকারখানার ধোঁয়ায় থাকা সালফার-ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড বৃষ্টির জলের সাথে বিক্রিয়া করে অ্যাসিড তৈরি করে। বৃষ্টির জলে থাকা অ্যাসিড জীবজগতের ও মার্বেল পাথরে তৈরি মূর্তি, সৌধ প্রভৃতির ক্ষতি করে।

ওজোন স্তর: আমাদের জীবনে ব্যবহৃত জিনিস যেমন ফ্রিজ, এসি, স্প্রে, রং থেকে নির্গত ক্লোরোফ্লুরো কার্বন গ্যাস ওজোন স্তরকে ক্ষয় করছে। এছাড়া পারমাণবিক বিস্ফোরণ, দ্রুতগামী বিমান থেকে নির্গত নাইট্রোজেন অক্সাইড ওজোন স্তরের ক্ষতি করছে। ফলে ওজোন স্তর পাতলা হওয়ায় ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মি পৃথিবীতে এসে পৌঁছচ্ছে। এতে ক্যানসার, চোখের অসুখ বেড়ে চলেছে।

প্রতিরোধ:

১) দূষণহীন যানবাহন যেমন, ইলেকট্রিক ট্রেন, মেট্রো, সাইকেলের ব্যবহার বাড়ানো।

২) রাস্তার দু-ধারে প্রচুর গাছ লাগানো।

৩) কয়লা, পেট্রোল, ডিজেল প্রভৃতি প্রচলিত শক্তির ব্যবহার কমিয়ে সৌরশক্তি, জোয়ার-ভাঁটাশক্তি, বায়ুশক্তি প্রভৃতি অপ্রচলিত শক্তির ব্যবহার বাড়ানো।

৪) কলকারখানা বা শিল্পকেন্দ্রগুলি লোকালয় থেকে দূরে তৈরি করা।

৫) বাস বা ট্রেনের মতো গণপরিবহনে অনেক লোক একসঙ্গে যাতায়াত করা যাতে কম গাড়ি ব্যবহার হয়।

শব্দদূষণ: শব্দ যখন মানুষের পক্ষে অসহ্য, যন্ত্রণাদায়ক ও বিরক্তিকর হয় তখন তা শব্দ দূষণের সৃষ্টি করে। সাধারণত ৬৫ ডেসিবেলের বেশি জোরে শব্দে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর নানা শারীরিক ও মানসিক অসুবিধা হয়। মূলত লাউডস্পিকার, মোটরযান, মোটরসাইকেল, উচ্চস্বরে গানবাজনা, কলকারখানার শব্দ, সাইরেন ইত্যাদি থেকে শব্দ দূষিত হয়। ফলাফল—

ক) শব্দদূষণের ফলে শোনার ক্ষমতা ধীরে ধীরে কমে যেতে পারে।

খ) অনেকক্ষণ ধরে জোরে শব্দ শুনলে ক্লান্তি আসে। এছাড়া অনিদ্রা, উচ্চ রক্তচাপ, চোখের রোগ, স্নায়ুর দুর্বলতা প্রভৃতি রোগ দেখা দিতে পারে।

নিয়ন্ত্রণ: অকারণে হর্ন বাজানো, উচ্চস্বরে রেডিও, লাউডস্পিকার, টিভি চালানো, শব্দবাজি বন্ধ করা উচিত।

স্কুল, হাসপাতাল ও বাড়ি থেকে শব্দের উৎস কমানো দরকার।

সরকারি স্তরে কঠোর আইন করে শব্দদূষণ বন্ধ করা উচিত।

ক্লাস সিক্স-এর টিউশন | ইংরেজি

I Will Go With My Father A Ploughing

(আই উইল গো উইথ মাই ফাদার অ্যা প্লাওয়িং) আমি বাবার সঙ্গে চাষ করতে যাব

আজ আমাদের পাঠ্য জোসেফ ক্যাম্পবেলের লেখা একটি কবিতা। কবিতাটি একজন পুত্রের বয়ানে লেখা। তার বাবা চাষি আর সে বাবার সঙ্গে আনন্দে মাটি খোঁড়া, বীজ বোনা আর ফসল কাটা-সব কাজই করতে চায়। তিনটি আলাদা অনুচ্ছেদে সে কী কী করতে চায়—সেগুলো কবি কবিতায় তুলে ধরেছেন।

কবি (১৮৭৯-১৯৪৪) একজন বিখ্যাত আইরিশ কবি আর গীতিকার ছিলেন। সংগীত চর্চার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সাহিত্যচর্চা শুরু হয়। তাঁর কিছু বিখ্যাত কবিতা হল 'অ্যাট হারভেস্ট', 'অন ওয়াকিং দ্য ব্লাইন্ড অ্যাট দ্য ফেয়ার', 'দ্য ওল্ড ম্যান' ইত্যাদি।

কবিতাটা সম্পর্কে এবার কিছু জেনে নেওয়া যাক। প্রথমে বাবার সঙ্গে চাষের কাজে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। সবুজ জমিটি সমুদ্রের ধারে। সেখানে গেলেই দাঁড়কাক, কাক আর গাঙচিলেরা ঘিরে ধরে। ছেলেটি কল্পনা করে যে শান্ত ঘোড়া আর শান্ত বাতাসে ভরতপাখিকে গান শোনাবে। তার বাবাও চাষের গান গাইবেন— যে গানে চাষের জন্যে আশীর্বাদ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বীজ বপনের কথা বলা হয়েছে। চাষের জন্যে তৈরি করা লাল মাটিতে বীজ বোনার সময়ে কাক, দাঁড়কাক, আর হরবোলা পাখিরা ঘিরে ধরে। ছেলেটি বীজ খেতে আসা গায়ক পাখি আর একটানা বীজ বুনে যাওয়া চাষিদের গান শোনাবে। তার বাবা বীজ বোনার যে গান গাইবেন তা শুধু অভিজ্ঞ মানুষেরাই জানেন। সবার শেষে ফসল কাটার সময়েও সে বাদামি খেতে যাবে। তখন রাজ হাঁস, কাকেরা আর বাচ্চারা তাকে ঘিরে ধরবে। সে তখন রোদে তামাটে হয়ে যাওয়া চাষিদের আর ছোট্ট গায়ক পাখিকে গান শোনাবে। তার বাবা তখন ফসল কাটার আনন্দে কাস্তের গান গাইবেন।

শব্দার্থ: ploughing (প্লাওইং) - চাষ করা, rooks (রুকস) - দাঁড়কাক, seagull (সিগাল) - গাঙচিল, flocking (ফ্লকিং) - দলে দলে এগিয়ে যাওয়া, lark (লার্ক) - এক জাতীয় পাখি, sowing (সোয়িং) - বীজ বোনা, starling (স্টার্লিং) - ময়না জাতীয় পাখি, sower (সোয়ার) - বীজবপনকারী, wise (ওয়াইজ) - জ্ঞানী, finch (ফিঞ্চ) - এক প্রকারের পাখি, reaping (রিপিং) - ফসল কাটা, geese (গিস) - রাজ হাঁসেরা, tan (ট্যান) - রোদে তামাটে হওয়া রং, wren (রেন) - এক প্রকারের ছোট পাখি, scythe (স্কাইদ) - কাস্তে, harvest (হারভেস্ট) - চাষ করা।

1. Answer the following questions.

a) what is the poem about?

The poem is about a child's experience of ploughing with his father.

b) Why will the father and child will sing while ploughing, sowing and reaping?

The child and his father will sing songs while ploughing, sowing and reaping because they enjoy the whole course of work.

c) What are the different colours of field at different stages of farming?

the field is green at the time of ploughing, red at the time of sowing and brown at the time of harvesting.

d) When the scythe is used in farming?

Scythe is used to reap.

2. Fill in the blanks with proper words.

a) I will sing to the striding sowers.

b) I will sing to the patient horses.

c) I will sing to the tan faced reapers.

3. Write whether the following statements are T (true) or F (false).

a) The child likes poughing. T

b) Only wise men know the song of sowing. T

c) The field is beside hill. F

d) The farmers work at night. F

e) The child's father will sing the scythe song. T

4. Identify the type of following sentences.

a) what is your favourite job? Interrogative sentence.

b) I like farming. Assertive sentence.

c) Oh! The song of the bird is so sweet. Exclamatory sentence.

d) Farmers are not tired of hardships. Negative sentences.

5. Write opposite words.

reaping = sowing

patient = impatient

bless = curse

joy = sorrow

6. Fill in the blanks with appropriate prepositions.

a) The father sings while harvesting.

b) The field is by the sea.

c) Birds are coming flocking after the boy.

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ২৭ ডিসেম্বর ২০১৬

ক্লাস সেভেন-এর টিউশন | বিজ্ঞান

পরিবেশবান্ধব শক্তি

আগের পর্যায়ে আমরা তড়িৎ শক্তির উৎস ও প্রভাব সম্বন্ধে জেনেছি। আজ আমরা পরিবেশবান্ধব কিছু শক্তির ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করব। আমাদের দৈনন্দিন জীবন এই শক্তিগুলো ছাড়া অচল। এই শক্তির উৎস মূলত আমাদের পরিবেশ। পরিবেশের বিভিন্ন উৎস থেকে নানা মাধ্যম ও যন্ত্রের ব্যবহারে আমরা এই শক্তিকে নিজেদের উপযোগী করে তুলি। এই শক্তিগুলোরও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কিন্তু এই শক্তিগুলোর অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার করার ফলে পরিবেশ দূষিত হয়। ঘুম থেকে ওঠা থেকে ঘুমোতে যাওয়া অবধি এই শক্তিগুলোর ওপর আমাদের জীবন পুরোপুরি নির্ভর। তাই প্রয়োজনের অজুহাতে মানুষ এই শক্তিগুলোর অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার করে পরিবেশের ভারসাম্য ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

তাপশক্তির ব্যবহার: যেসব কাজে তাপশক্তি আমরা ব্যবহার করি সেগুলি হল রান্না করতে, ইস্ত্রি করতে, কামারশালায় লোহা পিটিয়ে নানারকম যন্ত্র তৈরি করতে, বিদ্যুৎ উৎপাদনে, ইট বানাতে, বিভিন্ন জিনিস পোড়াতে।

তড়িৎশক্তির ব্যবহার: বিভিন্ন রকম ইলেকট্রনিক্স জিনিস চালনা করতে তড়িৎ শক্তির প্রয়োজন হয়। ট্রাম চালাতে, ট্রেন-মেট্রোরেল চালাতে, আলো জ্বালাতে, কম্পিউটার চালাতে, মোবাইল ফোন চার্জ দিতে, বড় বড় কলকারখানা চালাতে এই শক্তির ব্যবহার অনস্বীকার্য। জনসংখ্যার বৃদ্ধির কারণে দিন দিন এই শক্তির ব্যবহার বাড়ছে।

জীবাশ্ম তেল থেকে পাওয়া শক্তির ব্যবহার: বহু বছর ধরে সমুদ্রের তলায় যে জীবাশ্ম তৈরি হয় তার থেকে যে পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন প্রভৃতি পাওয়া যায় তা বিভিন্ন কাজে যেমন জেনারেটর, লঞ্চ, গাড়ি, এরোপ্লেন চালাতে ব্যবহার করা হয়। এই শক্তির ব্যবহারের ফলে আমাদের জীবন হয়েছে অনেক সহজ ও দ্রুত। কারণ বর্তমান যুগের জীবনযাত্রা অনেকটাই নির্ভর করে যানবাহনের উপর।

এই ধরনের প্রচলিত শক্তির চাহিদা বাড়ার মূল কারণ হল জনস্ফীতির সঙ্গে উন্নততর জীবনযাত্রা, নগরায়ন এবং যন্ত্র-নির্ভর সভ্যতা।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে কিছু জিনিস সরাসরি যুক্ত, যেমন খাদ্য উৎপাদন, বাসস্থান নির্মাণ, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা। এগুলি আবার প্রচলিত কিছু শক্তির ওপর নির্ভরশীল। মাটির তলায় জীবাশ্ম থেকে আমরা যে শক্তি পাই তা তৈরি হতে কোটি কোটি বছর সময় লেগেছে, আবার এই শক্তির জোগানও সীমিত। মানুষ খুব কম সময়ের মধ্যে এই শক্তির অধিকাংশ ব্যয় করে ফেলেছে। এবং অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের ফলে একদিন কয়লা ও খনিজ তেলের ভাণ্ডারও শেষ হয়ে যাবে। তবে এই জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার যত বেড়েছে পরিবেশে বেড়েছে তার দহনে উৎপন্ন পদার্থগুলির বহুমুখী ক্ষতিকারক প্রভাব। এই ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে বাঁচতে গেলে নিজেদের বিকল্প শক্তির সন্ধান করতে হবে, যেগুলো অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতি করবে। এগুলোই হল পরিবেশবান্ধব শক্তি।

এগুলি হল সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি ও জৈবশক্তি।

উদ্ভিদ ও প্রাণীরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির উপর নির্ভরশীল। তার মধ্যে অন্যতম হল সৌরশক্তি। বর্তমান যুগে বিদ্যুৎশক্তির চাহিদা বাড়ার ফলে সৌরকোষের ব্যবহার শুরু হয়েছে। দিনেরবেলা যে সূর্যের আলো পৃথিবীতে এসে পৌঁছয়, তাকে কাজে লাগিয়ে এই সৌরকোষে বিদ্যুৎ তৈরি হয়। তারপর সৌর প্যানেলের সঙ্গে যুক্ত ব্যাটারিতে তা সঞ্চয় করা হয়। রাতের বেলা বা কম সূর্যের আলোতে তা ব্যবহার করা যায়। আশা করা যায় আগামিদিনে এই শক্তির ব্যবহার ব্যাপক হারে দেখা যাবে।

বায়ুশক্তি:

আরও একটি পরিবেশবান্ধব শক্তি যা খুব একটা এখনও ব্যবহৃত হয়নি তা হল বায়ুশক্তি। বায়ুপ্রবাহের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে এই ধরনের বিদ্যুৎশক্তি তৈরি করা সম্ভব। বায়ুপ্রবাহের শক্তি ব্যবহারের কিছু সুবিধা আছে সেগুলি হল—

১) বায়ুর কোনও অভাব নেই, কোনওদিন বায়ু ফুরিয়ে যাবার সম্ভাবনা নেই।

২) বায়ুকল একবার বসলে দীর্ঘদিন চলবে।

৩) যে-সমস্ত জায়গায় দূর থেকে তার সংযোগ করে বিদ্যুৎ আনা সম্ভব নয়, সেখানে বায়ুশক্তির উপর নির্ভর করা যেতে পারে।

৪) বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহার না করে বায়ুশক্তির সাহায্যে পালতোলা নৌকা চালানো হয়।

জৈবশক্তি:

জৈব বর্জ্য বা জৈব উৎসজাত পাওয়া জিনিস থেকে উৎপন্ন জৈব গ্যাস থেকে যে শক্তি উৎপাদিত হয় তা হল জৈবশক্তি।

এসব প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ বর্জ্য পদার্থের ভাণ্ডার অফুরন্ত এবং সহজলভ্য। জ্বালানির কাজে এই শক্তিকে ব্যবহার করা যেতে পারে। জোয়ার-ভাঁটার শক্তি, মাটির নীচের তাপশক্তিকে প্রচলিত শক্তির বিকল্প হিসাবে ব্যবহারের জন্য বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে চলেছেন। এছাড়া বিভিন্ন প্রাকৃতিক গ্যাসকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করতে হবে। অপ্রচলিত পরিবেশবান্ধব শক্তি ব্যবহারের বিষয়ে সকলের সচেতনতা সুনিশ্চিত করতে হবে।

ক্লাস সেভেন-এর টিউশন | ইতিহাস

দিল্লি সুলতানি

মহম্মদ ঘোরি মারা গেলে দিল্লির শাসক হন কুতুবুদ্দিন আইবক। তিনি সুলতানি শাসন চালু করেন। সুলতান একটি আরবি শব্দ এবং এর অর্থ শাসন বা ক্ষমতা। মূলত তুর্কির শাসকরাই এই উপাধি ব্যবহার করতেন। যেখানে সুলতানের শাসন চলত সেই জায়গাকে বলা হত সুলতানি। দিল্লিকে কেন্দ্র করে ভারতে তুর্কি শাসন চালু হয় তাই দিল্লি ছিল সুলতানি।

তবে ইসলাম ধর্মে প্রধান শাসক ছিলেন ধর্মগুরু বা খলিফা। তাঁর অধীনে সুলতানরা শাসনকার্য চালাতেন। তবে অনেক বড় অঞ্চল হলে খলিফার পক্ষে সবদিক দেখাশোনা করা সম্ভব হতো না, তাই তিনি অন্যান্য ব্যক্তিদের নিয়োগ করতেন দেখাশোনার জন্য।

মহম্মদ ঘোরি মারা গেলে তাঁর রাজ্যের চার ভাগ করা হয়। দিল্লির সুলতানি পান কুতুবুদ্দিন আইবক, তবে গজনির শাসক তাঁর রাজ্য অধিকার করতে চাইলেই বাধে দ্বন্দ্ব। কুতুবুদ্দিনের পরে ক্ষমতায় আসেন তাঁর জামাই ইলতুতমিস। এবার সমস্যা আরও জটিল হয়। কেউ তাকে দিল্লির সুলতান বলে মানতে চায় না, কারন তিনি জামাই, ছেলে নন। ফলে ক্ষমতাবান তুর্কি শাসকরা যেমন খুশি তাঁর রাজ্য দখল করতে থাকে। তখন ইলতুতমিস দিল্লিতে তাঁর অধিকার কায়েম রাখার জন্য খলিফাকে লিখিত দিতে অনুরোধ করেন, খলিফা তা দিলে দিল্লিতে ইলতুতমিসের কর্তৃত্ব কায়েম হয়। তবে দিল্লির সুলতানদের ক্ষমতা ছিল অনেক আর এভাবেই তারা ৩২০ বছর শাসন করে কারণ খলিফারা ভারতের ব্যাপারে বিশেষ নাক গলাতেন না।

খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের প্রথমভাগ:

ইলতুতমিসের সময় তিনটি সমস্যা প্রধান হয়ে দাঁড়ায়, তা হল সাম্রাজ্যের মধ্যেকার বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহ দমন করা, মোঘল শক্তির মোকাবিলা এবং ইলতুতমিসের পরে উত্তরাধিকার নির্দিষ্ট করা অর্থাৎ সুলতানিকে এক রাজবংশে নিয়ে আসা। ইলতুতমিসের এক পুত্র কিছুদিনের জন্য সিংহাসনে বসলেও তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন তাঁর কন্যা রাজিয়া। একজন নারী হিসাবে তিনিই প্রথম ও শেষ মহিলা যিনি দিল্লির মসনদে বসেছিলেন। সেনাবাহিনী ও অভিজাতদের একাংশের অনুরোধে রাজিয়া সাম্রাজ্ঞী হয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু অভিজাতদের একাংশ, দিল্লির বাইরে থাকা তুর্কি অভিজাতরা এবং রাজপুত শক্তি এর বিরোধিতা করেছিলেন। এইসময় সুলতান ও তুর্কি অভিজাত অর্থাৎ চিহলগানির সম্পর্ক খারাপ হয়। এছাড়া উলেমার আপত্তি থাকা সত্ত্বেও রাজিয়া অ-মুসলিমদের উপর থেকে জিজিয়া কর তুলে নেন। এটা অনেকেই ভালো চোখে দেখেননি। কিছু বিদ্রোহ রাজিয়া দমন করলেও মাত্র সাড়ে তিন বছর তিনি রাজত্ব করেছেন।

গিয়াসউদ্দিন বলবন– রাজিয়ার মৃত্যুর পরে তাঁর এক ভাই সিংহাসনে বসেন, সেইসময় এক তুর্কি আমির বলবান হয়ে ওঠেন এবং পরবর্তীকালে তিনি নিজেই নিজেকে শাসক বলে ঘোষণা করেন, তিনি ছিলেন গিয়াসউদ্দিন বলবন। তিনি এবং তাঁর উত্তরাধিকারী প্রায় সাড়ে তিন দশক শাসন চালান, কুতুবুদ্দিন থেকে বলবন অবধি রাজত্বকালের সবাই ছিলেন ইলবারি তুর্কি সম্প্রদায়, তাঁদের আরেকটি নাম ছিল মামেলুক বা দাস।

বলবন সেইসময় ভারতের বিদ্রোহগুলিকে কঠোর হাতে দমন করে ভারতের অবস্থা অনেকটা স্থিতিশীল করেন। অভিজাতদের থেকে যে সুলতানদের ক্ষমতা বেশি, তা বোঝানোর জন্য তিনি সিজদা ও পাইবস প্রথা চালু করেন। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে তাঁর আমলে ভারতের অবস্থার কিছুটা হলেও উন্নতি হয়। এছাড়া এই সময় গঙ্গা ও যমুনার দোয়াব অঞ্চলে সুলতানরা ক্ষমতা বিস্তার করেন। বন কেটে আবাদি জমি চাষিদের মধ্যে বিলি করা হয়। ফলে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হয় এবং গ্রাম হয়ে ওঠে শহর।

সুলতানির প্রধান হলেন সুলতান কিন্তু কুতুবুদ্দিন আইবক থেকে বলবন পর্যন্ত দীর্ঘসময় নানারকম অরাজকতা চলেছে এই সুলতান নির্ধারণ বিষয়ে। কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম ছিল না, যে যেভাবে পেরেছে ক্ষমতায় এসেছেন ফলে দেশের শাসনের ভিত যেমন ছিল নড়বড়ে তেমনি শুরু হয়েছিল অরাজকতা।

দাক্ষিণাত্যে সুলতানি বিস্তার:

উত্তরে ক্ষমতা বিস্তারের পর আলাউদ্দিন খিলজি দক্ষিণে ক্ষমতা বিস্তারে মন দেন। তাঁর সেনাপতি মালিক কাফুর তাঁকে এই বিষয়ে অনেক সাহায্য করেছিলেন।

খ্রিস্টীয় চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতক:

চতুর্দশ শতকের প্রথম কুড়ি বছর খলজি সুলতানরা শাসন চালায়। এরপর আসে তুঘলক বংশ, এইসময় মহম্মদ বিন তুঘলকের শাসনকাল ছিল উল্লেখযোগ্য। এইসময় উত্তর আফ্রিকার মরক্কো দেশের তাঞ্জিয়ার শহরের ইবন বতুতা এই দেশে এসে এক ভ্রমণ বিবরণী লেখেন অল-রিহলা বা কিতাব-উর-রিহলা নামে, যেখান থেকে এই সময়ের একটি নির্ভরযোগ্য বিবরণ আমরা পাই।

স্মরণীয় যাঁরা
(২৭ ডিসেম্বর - ২ জানুয়ারি)

সঙ্গীতশিল্পী, লেখক এবং অনুবাদক
ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী
(**জন্ম:** ২৯ **ডিসেম্বর** ১৮৭৩, মৃত্যু: ১২ আগস্ট, ১৯৬০)

কৈশোরে তিনি বালক পত্রিকায় রাস্কিনের রচনার বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধসহ জাপানযাত্রীর ডায়েরী-র ইংরেজি অনুবাদও তিনি প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে বামাবোধিনী, বঙ্গলক্ষ্মী, সাধনা, পরিচয়, সবুজপত্র প্রভৃতি পত্রিকায় সঙ্গীত ও সাহিত্যবিষয়ে তাঁর অনেক মৌলিক রচনা প্রকাশিত হয়। বঙ্গনারীর শুভাশুভ বিষয়ে তাঁর মতামত 'নারীর উক্তি' নামক প্রবন্ধে বিধৃত হয়েছে। ইন্দিরা দেবী রবীন্দ্রসঙ্গীতে এবং পিয়ানো, বেহালা ও সেতারবাদনে পারদর্শিনী ছিলেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপি রচনা তাঁর এক অমর কীর্তি। 'মায়ার খেলা', ভানুসিংহের পদাবলী', কালমৃগয়া' প্রভৃতি সহ আরও দুশো রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপি রচনা এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতের বহু স্বরলিপি গ্রন্থ তিনি সম্পাদনা করেন। শান্তিনিকেতনে ইন্দিরা দেবী 'আলাপনী মহিলা সমিতি' প্রতিষ্ঠা ও তার মুখপত্র ঘরোয়া প্রকাশ করেন। ১৯৫৬ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্বও পালন করেন।

যুগশঙ্খ
SUPPLI
মঙ্গলবার, ২৭ ডিসেম্বর ২০১৬

স্মরণীয় যাঁরা
(২৭ ডিসেম্বর - ২ জানুয়ারি)

পল্লিগীতি এবং লোকসংগীত শিল্পী
আব্বাসউদ্দিন আহমেদ
(জন্ম: ২৭ অক্টোবর ১৯০১, মৃত্যু: **৩০ ডিসেম্বর, ১৯৫৯**)

তাঁর আত্মজীবনী 'আমার শিল্পী জীবনের কথা' একটি দলিল। ভাওয়াইয়া, ক্ষীরোল চটকা গেয়ে আব্বাসউদ্দীন প্রথমে সুনাম অর্জন করেন। তারপর জারি, সারি, ভাটিয়ালি, মুর্শিদি, বিচ্ছেদি, দেহতত্ত্ব, মর্সিয়া, পালা গান ইত্যাদি গান গেয়ে জনপ্রিয় হন। তিনি নজরুল ইসলাম, জসীমউদ্দীন, গোলাম মোস্তফা প্রমুখের রচিত গানেও কণ্ঠ দিয়েছেন। দেশ বিভাগের পর ঢাকায় এসে তিনি সরকারের প্রচার দফতরে চাকরি করেন। দেশের প্রতিনিধি হিসেবে ১৯৫৫ সালে ম্যানিলায় দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় সংগীত সম্মেলন, ১৯৫৬ সালে জার্মানিতে আন্তর্জাতিক লোকসংগীত সম্মেলন এবং ১৯৫৭ সালে রেঙ্গুনে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে তিনি যোগদান করেন। কুচবিহার জেলার বলরামপুর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা জাফরআলী আহমদ ছিলেন উকিল। সংগীতে অবদানের জন্য তিনি মরণোত্তর প্রাইড অব পারফরমেন্স (১৯৬০), শিল্পকলা অ্যাকাডেমি পুরস্কার (১৯৭৯) এবং স্বাধীনতা দিবস পুরস্কারে (১৯৮১) ভূষিত হন।

ক্লাস এইট-এর টিউশন | বাংলা

পরবাসী

কবি-পরিচিতি: আধুনিক যুগের কবি বিষ্ণু দে ১৯০৯ সালে শ্যামাচরণ দে বিশ্বাস পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ হল 'উর্বশী ও আর্টেমিস', এর পরে ধীরে ধীরে 'চোরাবালি', 'নাম দিয়েছি কোমলগান্ধার', 'সেই অন্ধকার চাই', 'উত্তরে থাক মৌন', 'অন্বিষ্ট' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ লেখেন। এছাড়াও তিনি রচনা করেছেন প্রবন্ধ, যেমন—'রুচি ও প্রগতি', 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ মাইকেল', 'রবীন্দ্রনাথ' ইত্যাদি। এছাড়া আছে বিদেশি কবিতার অনুবাদ, যেমন—'এলিয়টের কবিতা', 'হে বিদেশি ফুল', 'আফ্রিকা ও এশিয়া' ইত্যাদি।

নামকরণের সার্থকতা: 'পরবাসী' কথার অর্থ হল যাদের নিজস্ব কোনও বাসস্থান নেই, অন্যের উপর নির্ভর করে বা অন্যের জমিতে বাস করে। কবি ছিলেন অরণ্যপ্রিয়। তিনি প্রকৃতির মধ্যে বেঁচে থাকতে চেয়েছেন, নদীর সেতারের মতো শব্দে বয়ে চলা বন্য পাখি ও পশুর নিজস্ব সাম্রাজ্য গুছিয়ে তোলা, হরিণের চুপি চুপি জল খেতে আসা, চিতার নিজ চালে হেঁটে চলে যাওয়া প্রভৃতি কবিকে মুগ্ধ করেছে।

আবার তিনি লক্ষ করেছেন, কীভাবে দিনের পর দিন গাছপালা কেটে জঙ্গল নষ্ট হয়েছে আর পড়ে থাকছে বৃক্ষহীন খালি জায়গা— সেখানে না গড়ে উঠেছে গ্রাম না শহর, খালি শুকনো হাওয়া ঘুরে বেড়ায় সেখানে। এই সব জায়গা ছিল কবির নিজের সেখানে সুন্দর কিছু গড়ে ওঠেনি ফলে কবি তাঁর নিজের বাসস্থান হারিয়ে ফেলেছেন, নিজের দেশে কবিকে পরবাসী হয়ে থাকতে হচ্ছে এটা কবি মেনে নিতে পারেননি। তিনি সারা দেশ ঘুরেও নিজের বাসা খুঁজে পাচ্ছেন না, এই পরিস্থিতিতে তাঁর কবিতার 'পরবাসী' নাম একেবারে সার্থক।

সারসংক্ষেপ: কবি প্রকৃতিপ্রেমী এবং বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসেন। তাঁবুর ছায়ায় তিনি হরিণের জল খাওয়া, বনমোরগের নাচ সমস্ত লক্ষ করেছেন। এই বন ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছেন পড়ে থাকছে কেবল শুকনো হাওয়া। কবি চিন্তিত তাঁর ভালোলাগার ভালোবাসার জায়গা হারিয়ে যাচ্ছেন। তিনি একা হয়ে পড়েছেন, পরবাসী হয়ে গেছেন। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন কেন মানুষের কাছে নদ-নদী, গাছপালা এত মূল্যহীন। কবি সারা দেশ ঘুরে ফেলেছেন নিজের দেশ পাওয়ার আশায় কিন্তু তিনি পেলেন না, তাঁকে পরবাসী হয়েই থাকতে হল।

শব্দার্থ: সেতার—তিনটি তারের বাদ্যযন্ত্র, কথক— জয়পুর, লখনউ, বেনারস ঘরানার নৃত্যশৈলী, কথাকলি— কেরলের বিশেষ নৃত্যশৈলী, পুলকে— আনন্দে, সাফ— পরিষ্কার, প্রান্তর— মাঠ, মৌন— চুপ, গৌণ—মূল্যহীন।

প্রশ্নোত্তর:

১) কবির লেখা দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম লেখো।

উত্তর: কবি বিষ্ণু দে-র লেখা দুটি কাব্যগ্রন্থ হল 'চোরাবালি', 'উর্বশী ও আর্টেমিস'।

২) তাঁর লেখা দুটি প্রবন্ধের নাম লেখো।

উত্তর: কবি বিষ্ণু দে-র লেখা দুটি প্রবন্ধের নাম হল 'রুচি ও প্রগতি' এবং 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ'।

৩) ফাঁকা প্রান্তরে কী ঘুরে বেড়ায়?

উত্তর: ফাঁকা প্রান্তরে শুকনো হাওয়া ঘুরে বেড়ায়।

৪) এই কবিতায় কবি কোন কোন গাছের কথা উল্লেখ করেছেন?

উত্তর: এই কবিতায় কবি শাল, শিমূল, পলাশ গাছের কথা উল্লেখ করেছেন।

৫) এই কবিতায় কোন কোন পশুর উল্লেখ কবি করেছেন?

উত্তর: এখানে কবি হরিণ, চিতা ও খরগোশের উল্লেখ করেছেন।

৬) চিতার চলে যাওয়ার ছন্দটি কেমন?

উত্তর: চিতার চলে যাওয়ার ছন্দটি লুব্ধ ও হিংস্র।

৭) কোথায় কবি ময়ূরকে নাচতে দেখেছেন?

উত্তর: পলাশের ঝোপে কবি বনময়ূরকে নাচতে দেখেছেন।

৮) নিম্নরেখাঙ্কিত শব্দের বদলে অন্য শব্দ বসিয়ে অর্থপূর্ণ বাক্য গঠন করো।

ক) এঁকেবেঁকে চলে প্রকৃতির **তালে তালে**।

উত্তর: **এঁকেবেঁকে** চলে প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে।

খ) বন্যপ্রাণের **কথাকলি** বেগ জাগিয়ে।

উত্তর: বন্যপ্রাণের **কলরবের** বেগ জাগিয়ে।

গ) তাঁবুর ছায়ায় নদীর **সোনালি সেতার**।

উত্তর: তাঁবুর ছায়ায় নদীর **রুপোলি ভঙ্গিমায়**।

৯) সেতারের বিশেষণ হিসাবে কবি সোনালি শব্দের ব্যবহার করেছেন কেন?

উত্তর: নদীর জলে সূর্যের আলো পড়ে যখন তা প্রতিফলিত হয়, তখন নদীর জলকে সোনালি দেখতে লাগে। বিশেষ করে ভোরবেলা আর সন্ধ্যাবেলা। নদীর বয়ে চলার শব্দকে কবি সেতারের সঙ্গে তুলনা করেছেন, তাই তার বিশেষণ হিসাবে কবি সোনালি শব্দ ব্যবহার করেছেন।

১০) 'জঙ্গল সাফ, গ্রাম মরে গেছে, শহরের/ পত্তন নেই'—প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে এই পঙ্‌ক্তিটির প্রাসঙ্গিকতা দেখাও।

উত্তর: পৃথিবীর জনসংখ্যা ক্রমে বেড়েই চলেছে, সেই সঙ্গে বেড়েছে মানুষের অন্ন-বস্ত্রের চাহিদা। এই চাহিদার দাবি মেটাতে গিয়ে রোজ বিপুল পরিমাণে প্রকৃতি নষ্ট হচ্ছে, গাছ কাটা পড়ছে, বাসা-হারা হচ্ছে বন্যপ্রাণ। কিন্তু সেই ফাঁকা জায়গায় রয়েছে শুকনো বাতাসের আনাগোনা। কোনও বসতি তৈরি হচ্ছে না। মানুষ গৃহহারা হয়ে থাকছে।

১১) ধ্বনিতাত্ত্বিক বিন্যাস করো।

তাঁবু = ত+অ+আ+ব+উ। পরবাসী = প+অ+র+অ+ব+অ+ব+অ+আ+স+ঈ

১২) সমাস:

বনময়ূর = বনে থাকে যে ময়ূর। [উপপদ তৎপুরুষ]

সেতার = সে ও তার। [দ্বন্দ্ব সমাস]

টীকা: সিন্ধুমুনি— ইনি ছিলেন অন্ধমুনির পুত্র। জলাশয়ে জল আনতে গিয়ে রাজা দশরথ কর্তৃক নিহত হন।

ক্লাস এইট-এর টিউশন | ভূগোল

জলবায়ু অঞ্চল

কোনও অঞ্চলের অক্ষাংশগত অবস্থানের উপর তার জলবায়ু নির্ভর করে এবং ভূমির উচ্চতা, সমুদ্র থেকে তার দূরত্ব, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতি সেই অঞ্চলের জলবায়ুকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।

ভূমির উচ্চতার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও জলবায়ুর পরিবর্তন হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের অবস্থান অনুযায়ী উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাতের তারতম্যের ফলে জলবায়ুও বিভিন্ন রকম হয়। যেমন— নিরক্ষীয় অঞ্চলে গরম আর বৃষ্টি বেশি তাই গাছপালাও বেশি, ক্রান্তীয় অঞ্চলে ছোট ছোট ঘাস আবার কোথাও মরুভূমি, উপক্রান্তীয় অঞ্চলে সরলবর্গীয় গাছের অরণ্য, আবার মেরু অঞ্চলে গুল্মজাতীয় গাছ, কারণ এখানে সারা বছরই উষ্ণতা হিমাঙ্কের নীচে থাকে।

কোনও বিস্তীর্ণ অঞ্চলে উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাত একইরকম হলে সেই অঞ্চলকে একটি বিশেষ জলবায়ুর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই জলবায়ুর তারতম্যের জন্য কোনও অঞ্চলের মৃত্তিকা, উদ্ভিদ ও মানুষের জীবনযাত্রায় তারতম্য দেখা যায়।

নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চল:

নিরক্ষীয় অঞ্চলে উষ্ণ-আর্দ্র জলবায়ুর জন্য সেখানে প্রচুর বৃষ্টি হয় ফলে সেখানে গভীর অরণ্যের সৃষ্টি হয়েছে। সেই কারণে একে নিরক্ষীয় বৃষ্টি অরণ্য অঞ্চলও বলে।

অবস্থান: নিরক্ষরেখার উভয়দিকে ৫°-১০° অক্ষাংশের মধ্যে এই অঞ্চল অবস্থিত। যেমন—আফ্রিকার কঙ্গো বা জাইরে নদীর অববাহিকা, দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন নদী অববাহিকা, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইনস, ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ, শ্রীলঙ্কার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ, ক্যারেবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চল এই জলবায়ুর অন্তর্গত।

উষ্ণতা: এই অঞ্চলে সূর্যরশ্মি লম্বভাবে পড়ায় দিন বড়, রাত ছোট আর গরম বেশি ফলে এখানে বার্ষিক উষ্ণতার প্রসার ২০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এখানে দিনের উষ্ণতা যেমন প্রায় ৩৮° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে পৌঁছয় তেমনি রাতে উষ্ণতা অনেক কমে যায়। এখানকার রাতকে ক্রান্তীয় শীতকালও বলা হয়ে থাকে। এখানে দিনের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার ফারাক অনেক বেশি।

বৃষ্টিপাত: এই অঞ্চল প্রচণ্ড গরম হওয়ায় এবং জলভাগের পরিমাণ বেশি হওয়ায় এখানে গভীর নিম্নচাপ হয়। উষ্ণ-আর্দ্র বাতাস শীতল ঘনীভূত হয়ে পরিচলন প্রক্রিয়ায় প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায় বছরে ২৫০-৩০০ দিন, আবার কোনও কোনও অঞ্চলে বছরে দু'বারও বৃষ্টি হয়। এখানে সকালে আকাশ পরিষ্কার থাকে। বিকেল ৩-৪টে নাগাদ কিউমুলোনিম্বাস মেঘে বৃষ্টি হয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়। এই জলবায়ু অঞ্চল নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয়, আন্তঃক্রান্তীয় অভিসরণ অঞ্চল দ্বারা প্রভাবিত।

জীববৈচিত্র:

উদ্ভিদ: এখানে সারা বছর গাছে ফলন হয়, তাই এটি চিরসবুজ অরণ্য। আমাজন নদী অববাহিকায় এই অরণ্য সেলভা নামে পরিচিত। এখানে রাবার, রোজউড, ব্রাজিল নাট, বাঁশ গাছ দেখা যায়। জাইরে নদী অববাহিকায় মেহগনি, রাবার, পাম, কোকো এইসব গাছের প্রাধান্য। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অরণ্যে শাল, সেগুন, তাল, নারকেল প্রভৃতি গাছ দেখা যায়। এই গাছের গুঁড়িগুলো শক্ত আর লম্বা আর পাতাগুলো চওড়া হয়, উপর থেকে দেখতে চাঁদোয়ার মতো লাগে। গাছের তলায় সূর্যালোক পৌঁছয় না বলে এখানে গুল্ম, লতা ও পরগাছা জাতীয় গাছ জন্মায়।

বন্যজন্তু: এখানে ঘন অরণ্যের জন্য পশুপাখির আধিক্য বেশি। বাঁদর, গরিলা, শিম্পাঞ্জি বিভিন্ন রকম সাপ, পাখি বিষাক্ত কীটপতঙ্গ দেখা যায়। এছাড়া গন্ডার, হাতি, হরিণ, কুমির ইত্যাদিও দেখা যায়।

আর্থ-সামাজিক পরিবেশ ও জীবনযাত্রা:

অধিবাসী ও জীবনযাত্রা: এখানে উষ্ণ-আর্দ্র অস্বাস্থ্যকর জলবায়ু। জঙ্গলের আধিক্যর জন্য জনবসতি বিরল। জাইরে অববাহিকায় পিগমি, উচ্চ আমাজন অববাহিকায় রেড ইন্ডিয়ান ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সেমাং ও অন্যান্য উপজাতির বসবাস দেখা যায়। বনের ফলমূল সংগ্রহ ও পশুশিকার এদের প্রধান কাজ। বর্তমানে স্থায়ী ও স্থানান্তর প্রক্রিয়ায় আদিম অধিবাসীরা ভূট্টা, মিষ্টি আলু, কলা ইত্যাদি চাষ করে।

অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় বণিকরা এখানে বাগিচা কৃষি শুরু করে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালয়, জাভা, সুমাত্রায় রাবার চাষ, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে আখ, কলার চাষ, আফ্রিকার গিনি উপকূলে কোকো ও তাল জাতীয় গাছের তেল উৎপাদন করে অধিবাসীরা জীবিকা নির্বাহ করে।

খনিজ সম্পদ ও শিল্প: নিরক্ষীয় অঞ্চলের মালয়-এ টিন, সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিয়-তে প্রচুর খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যায়। তবে ভারী শিল্প গড়ে তোলার জন্য যে পরিমাণ কাঁচামাল দরকার, তা না থাকায় এখানে ভারী শিল্প গড়ে ওঠেনি।

সাম্প্রতিক অবস্থা: অস্বাস্থ্যকর জলবায়ুর ফলে রোগ, প্রচণ্ড জঙ্গল, বিষাক্ত কীট-পতঙ্গের জন্য ম্যালেরিয়া প্রভৃতি এখানকার অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে এখানে জঙ্গল কেটে জনবসতি গড়ে উঠেছে এবং এর চাহিদায় কৃষি, শিল্প ও পরিবহনের সার্বিক উন্নতি হলেও পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে। ১৯৭০ সালে ট্রান্স-আমাজন হাইওয়ের মাধ্যমে এই অঞ্চল বহির্বিশ্বের সাথে যুক্ত হয়, আর সেই সঙ্গে জীববৈচিত্র এবং পরিবেশের অবক্ষয় ত্বরান্বিত হয়।

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ২৭ ডিসেম্বর ২০১৬

ক্লাস নাইন-এর টিউশন | ইংরেজি

His First Flight

(হিজ ফার্স্ট ফ্লাইট) ছেলেটির প্রথম উড়ান

আজ আমাদের পাঠ্য লিয়াম ও'ফ্ল্যাহার্টি (১৮৯৬-১৯৮৪)-র লেখা ছোটগল্পের বাছাই অংশ। এই গল্পে একটা ছোট গাংচিলের প্রথম ওড়ার গল্প আছে। ভয় কাটিয়ে তার প্রথম উড়তে শেখার মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের জীবনের কথাই খুঁজে পাই। আমরাও জীবনে এভাবেই ভয় ও মুশকিল কাটিয়ে একের পর এক বাধা টপকে এগিয়ে যাই।

লেখক ছিলেন একজন খ্যাতনামা আইরিশ ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্প লেখক। তাঁর লেখা বিখ্যাত বইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'দ্য ইনফরমার', 'রিটার্ন অব দ্য ব্রুট', 'হাউস অব গোল্ড' ইত্যাদি।

গল্পের বাচ্চা সিগালটি বসেছিল সমুদ্রতীরের কাছে জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা একটি শিলার উপরে। ওড়ার কথা ভাবতেই তার মনে নানা দুশ্চিন্তা এসে উপস্থিত হচ্ছিল। তার ডানা বোধ হয় তার ওজন নিতে পারবে না। এরকম কত কিছু। আগের দিনই তার দুই ভাই আর বোন উড়তে শিখেছে। তাদের মা-বাবা খুব উৎসাহের সঙ্গে তাদের ওড়া ও মাছ ধরা শিখিয়েছে। কিন্তু ছোট্ট সিগাল বারবার উড়তে গিয়েও পিছিয়ে আসছে। তারা যেন একটু মনক্ষুণ্ণ ছোট্ট সিগালের কাণ্ডকারখানায়। গতকাল রাত থেকে সে কিছুই খেয়েছিল না বলে তার খিদেও পাচ্ছিল, বাসার খাবারও সব শেষ। সে প্রথমে রাস্তা খোঁজার চেষ্টা করল যা দিয়ে হেঁটে সে তার বাবা-মার কাছে পৌঁছতে পারে। কিন্তু পাথরগুলো এমন খাড়া যে সেখান দিয়ে হাঁটা সম্ভব না। খানিক পরে দেখল তার মা খাবার মুখে নিয়ে এসে তার থেকে খানিক দূরে দাঁড়িয়ে আছে, খিদের জ্বালায় সে খাবার নিতে ঝাঁপ দিল। হঠাৎ দেখল সে ভাসছে এবং তার সারা শরীরে হাওয়া ধাক্কা মারছে। এই ভাবে ভয় কাটিয়ে ছোট্ট সিগালটি উড়তে শিখে গেল।

শব্দার্থ: ledge (লেজ) - সমুদ্রতীরে জলের মধ্যে থাকা পাথর, blink (ব্লিংক) - শেষপ্রান্ত, shrilly (শ্রিলি) - তীক্ষ্ণ ও উচ্চস্বরে, ascending (অ্যাসেন্ডিং) - উপরে ওঠা, preening (প্রীনিং) - পালকে চকচকে মোলায়েম করে সাজানো, scrap (স্ক্র্যাপ) - ছোট টুকরো, blazing (ব্লেজিং) - উজ্জ্বল, trotted (ট্রোটেড) - দোলা, maddened (ম্যাডেনড) - পাগলের মতো, motionless (মোশনলেস) - নিশ্চল, outwards (আউটওয়ার্ডস) - বাইরের দিকে, soaring (সোরিং) - উপরের দিকে ওড়া, beckoning (বিকোনিং) - ইশারাতে ডাকা, flapped (ফ্ল্যাপড) - ডানা ঝাপটানো, headlong (হেডলং) - দ্রুত।

1. Choose the correct answer and write.

a) At night the seagull slept in a little- nest/ turret/ hole. (hole)

b) The colour of the seagull's body was- black/ grey/ blue. (grey)

c) The mother seagull had picked up a piece of- insect/ fish/meat. (fish)

d) The ledge faced the- north/ south/ east/ west. (south)

2. Answer the following questions.

a) What was the first catch of the seagull's older brother?

The first catch of the seagull's older brother was a herring.

b) Why did the seagull dive at the fish?

The seagull dived at the fish because he was maddened by hunger.

c) What happened when the seagull soared upward?

When the seagull soared upward he uttered a joyous scream and flapped his wings again.

d) Why did the seagull feel the heat?

The seagull was feeling heat because the sun was ascending the sky and blazing warmly.

e) Why was the seagull afraid when he ran forward to the brink of the ledge?

When the seagull ran forward to the brink of the ledge, he left certain that his wings will never be able to support his body while flying.

f) What were the seagull's two brothers and sisters doing on the plateau?

The seagull's two brothers and sister were lying on the plateau and dozing with their heads sunk into their wings.

g) What happened after the seagull's feet sank into the sea?

After his feet sank, his belly touched the water, he started to float on the water.

3. Join the sentences.

a) His feet sank into the sea. Around his belly touched it. [and]

His feet sank into the sea and around his belly touched it.

b. He could feel the tips of his wings cutting through the air. [that]

He could feel the tips of his wings that cutting through the air.

ক্লাস নাইন-এর টিউশন | ভৌতবিজ্ঞান

পৃষ্ঠটান

কোনও তরলের মুক্তপৃষ্ঠে সবসময় যে টান কাজ করে এবং যার প্রভাবে তরলপৃষ্ঠ একটি টান করা পাতলা পর্দার মতো আচরণ করে এবং এর ক্রিয়াতেই তরলের মুক্তপৃষ্ঠ সর্বদা ক্ষুদ্রতম ক্ষেত্রফলে সংকুচিত হওয়ার চেষ্টা করে।

কোনও তরল পৃষ্ঠের উপর একটি রেখা কল্পনা করলে, ওই রেখার প্রতি একক দৈর্ঘ্যে রেখার উপর লম্বভাবে এবং পৃষ্ঠের স্পর্শক ভাবে ক্রিয়াশীল বলকে ওই তরলের পৃষ্ঠটান বলে। পৃষ্ঠটানের SI একক হল নিউটন। প্রতি মিটার N/m এবং CGS একক হল ডাইন প্রতি সেন্টিমিটার dyne/cm।

তরলের পৃষ্ঠটান উষ্ণতা, দূষণ, দ্রবীভূত বস্তু, তরলের চারপাশের মাধ্যম, ইত্যাদি বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

সান্দ্রতা: কোনও প্রবহমান তরলের দুটি পাশাপাশি স্তরের মধ্যে বেগের পার্থক্য থাকলে, তরল দুটি স্তরের আপেক্ষিক গতি কমাতে চায় অর্থাৎ দ্রুত গতিসম্পন্ন স্তর ধীরগতির স্তরের বেগ বাড়াতে চায় আবার ধীর গতির স্তর দ্রুতগতির স্তরের বেগ কমাতে চায়। তরলের এই ধর্মকে সান্দ্রতা বলে।

দুই স্তরের মধ্যে ক্রিয়াশীল সান্দ্রবল দুই স্তরের মধ্যে আপেক্ষিক গতিবেগ কমানোর চেষ্টা করে। সান্দ্রবলকে অভ্যন্তরীণ ঘর্ষণও বলা যায়। এই বলটি তরলের বিভিন্ন গতিসম্পন্ন দুটি স্তরের স্পর্শতলের স্পর্শক বরাবর কাজ করে। সান্দ্রবল তরলের প্রকৃতি, স্পর্শতলের

ক্ষেত্রফল ও প্রবাহের লম্বদিকে দূরত্বের সঙ্গে বেগ পরিবর্তনের হারের উপর নির্ভর করে।

সান্দ্রবল ও ঘর্ষণ বলের মিল হল: (ক) উভয়েই গতিতে বাধা দেয়, (খ) আপেক্ষিক গতি থাকলেই ক্রিয়া করে, (গ) আন্তঃআণবিক বলের উপর নির্ভর করে।

সান্দ্রবল ও ঘর্ষণ বলের অমিল হল: (ক) সান্দ্রবল স্পর্শতলের ক্ষেত্রফলের সমানুপাতিক, কিন্তু ঘর্ষণ বল নয়। (খ) সান্দ্রবল তরল স্তরের আপেক্ষিক বেগের উপর নির্ভর করে, কিন্তু ঘর্ষণ বল করে না।

ধারারেখ প্রবাহ: তরলের মধ্যে প্রতিটি বিন্দুতে তরলকণার বেগ অপরিবর্তিত থাকলে, সেই প্রবাহকে ধারারেখ বা স্থির প্রবাহ বলে। এক্ষেত্রে কোনও তরলকণা তার আগের কণার বেগ ও গতিপথ অনুসরণ করে। ধারারেখ প্রবাহে তরলকণা যে পথে চলে তাকে বলে প্রবাহরেখা। দুটি প্রবাহ রেখা পরস্পরকে ছেদ করে না। তরলের প্রবাহবেগ একটি নির্দিষ্ট বেগের অর্থাৎ সন্ধিবেগের কম হলে প্রবাহ ধারারেখ হয়।

অশান্ত প্রবাহ: তরলের বেগ সন্ধিবেগের বেশি হলে কোনও বিন্দুতে তরল কণার গতিবেগ অনিয়মিত ভাবে সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয় এবং কণাগুলি যে কোনও পথে প্রবাহিত হয়। এই প্রবাহকে অশান্ত প্রবাহ বলে।

ঘনত্ব ও সান্দ্রতার তুলনা: নির্দিষ্ট উষ্ণতায় কোনও পদার্থের একক আয়তনের ভর হল ঘনত্ব। যে ধর্মের জন্য প্রবাহী তার বিভিন্ন স্তরের আপেক্ষিক গতির বিরুদ্ধে বাধা সৃষ্টি করে তাকে সান্দ্রতা বলে। উভয়েই দুটি আলাদা রাশি। পদার্থের ঘনত্বের উপর পদার্থের সান্দ্রতা নির্ভর করে না।

সান্দ্র তরলের ভিতর দিয়ে একটি ছোট বস্তু নীচের দিকে পড়তে থাকলে সান্দ্রবল বস্তুর গতির বিরুদ্ধে কাজ করে, বস্তুর বেগের সাথে সান্দ্রবলও বৃদ্ধি পায়। তরলের মধ্যে বস্তুর উপর ঊর্ধ্বমুখী প্লবতা বলও কাজ করে। একসময় সান্দ্রবল তরলের মধ্যে বস্তুর আপাত ওজনের সমান হয় অর্থাৎ বস্তুর উপর লব্ধিবল শূন্য হয় ও বস্তুটি স্থিরবেগে নীচের দিকে পড়তে থাকে। এই স্থিরবেগকে সীমান্ত বেগ বা প্রান্তীয় বেগ বলে।

প্রান্তীয় বেগের মান বস্তুর আকার বড় হলে বেশি হয়, তরলের সান্দ্রতা বেশি হলে কম হয়, বস্তুর ঘনত্ব বাড়লে বেশি হয়, তরলের ঘনত্ব বাড়লে কম হয়। বস্তু তরলের চেয়ে হালকা হলে প্রান্তীয় বেগ ঊর্ধ্বমুখী হয়।

বারনৌলির নীতি:

প্রথম সূত্র: কোনও তরলে ধারারেখ প্রবাহ হলে প্রবাহ-নালীর যে কোনও প্রস্থচ্ছেদে তরলের একক ভরের চাপশক্তি, স্থিতিশক্তি ও গতিশক্তির যোগফল সর্বদা ধ্রুবক।

$p/d + gh + 1/2v \times v$ = ধ্রুবক - প্রবাহীর চাপ p, ঘনত্ব d, ভর m, আয়তন V, গতিবেগ v, কোনও নির্দিষ্ট তল থেকে উচ্চতা h। $p/d = pV/m$ একক ভরের চাপশক্তি, $gh = mgh/m$ একক ভরের স্থিতিশক্তি, $1/2v \times v = 1/2v \times v/m$ একক ভরের গতিশক্তি।

দ্বিতীয় সূত্র: ধারারেখ প্রবাহ হলে তরলের যে কোনও বিন্দুতে চাপশীর্ষ, উচ্চতাশীর্ষ ও বেগশীর্ষের যোগফল ধ্রুবক।

তৃতীয় সূত্র: আদর্শ তরলের শান্তপ্রবাহ হলে প্রবাহরেখার যে কোনও বিন্দুতে একক আয়তন তরলের চাপশক্তি, স্থিতিশক্তি ও গতিশক্তির যোগফল সর্বদা ধ্রুবক।

এই নীতি থেকে বোঝা যায় বায়ুপ্রবাহের বেগ বেশি হলে চাপ কম হয় ও বেগ কম হলে চাপ বেশি হয়।

স্মরণীয় যাঁরা

(২৭ ডিসেম্বর - ২ জানুয়ারি)

পল্লী কবি

জলীমউদ্দিন

(জন্ম: ১ জানুয়ারি ১৯০৩, মৃত্যু: ১৩ মার্চ, ১৯৭৬)

তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ রচনা 'নকশি কাঁথার মাঠ'। এটি ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। এখন পর্যন্ত বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তিনি ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৩ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা সহকারী পদে যোগ দেন। ১৯৩৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৯৬৯ সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে 'ডি লিট' উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁর কিছু কাব্যগ্রন্থ— 'রাখালী', 'নকশি কাঁথার মাঠ', 'বালু চর', 'ধানখেত', 'সোজন বাদিয়ার ঘাট'; নাটক— 'পদ্মাপার', 'বেদের মেয়ে', 'মধুমালা', 'পল্লীবধূ'; আত্মকথা— 'যাদের দেখেছি', 'ঠাকুর বাড়ির আঙ্গিনায়', 'জীবন কথা', 'স্মৃতিপট' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

যুগশঙ্খ
SUPPLI
মঙ্গলবার, ২৭ ডিসেম্বর ২০১৬

স্মরণীয় যাঁরা
(২৭ ডিসেম্বর - ২ জানুয়ারি)

বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী
আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু
(জন্ম: ১ জানুয়ারি ১৮৯৪, মৃত্যু: ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪)

তাঁর গবেষণার ক্ষেত্র ছিল গাণিতিক পদার্থবিদ্যা। তিনি আইনস্টাইনের সঙ্গে বোস-আইনস্টাইন পরিসংখ্যান প্রদান করেন, যা পদার্থবিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। তিনি কর্মজীবনে সম্পৃক্ত ছিলেন কলকাতা, ঢাকা ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে। সান্নিধ্য পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মাদাম ক্যুরি প্রমুখ মণীষীর। আবার বিপ্লবীদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রাখতেন ও সাহায্যও করতেন। তিনি বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন সারাজীবন ধরে। তিনি বলতেন, যাঁরা বলেন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান হয় না, তাঁরা হয় বাংলা জানেন না, নয় বিজ্ঞান বোঝেন না। এই উদ্দেশ্যে বিজ্ঞান পরিচয় নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশ করেন তিনি। তাঁর তত্ত্ব ও সূত্রের উপর গবেষণা করে আজ পর্যন্ত অনেক বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

ক্লাস টেন-এর টিউশন | ইতিহাস

ঔপনিবেশিক অরণ্য আইন ও আদিবাসী জনগণের প্রতিক্রিয়া

ব্রিটিশ শাসন শুরু হলে আদিবাসীরা গ্রাম ছেড়ে কয়লাখনি, চা-বাগান, কুলির কাজ নিয়ে অন্যত্র চলে যায়। ব্রিটিশ সরকার তখন রাজস্বের লোভে আবাদি জমির মালিকানা জমিদারদের হাতে দেয়। এই জমি-সংক্রান্ত অসন্তোষের মাঝে জমিদাররা মিলে গোদাবরীর উপত্যকায় অরণ্যচারী রুম্পা উপজাতির উপর কর ধার্য করলে, প্রতিবাদে শুরু হয় রুম্পা বিদ্রোহ।

বিদ্রোহ, অভ্যুত্থান ও বিপ্লব: বিদ্রোহ শব্দের অর্থ হল বিশেষ ভাবে হিংসা করা। কোনও একটি বিশেষ কারণে কোনও জাতির ক্ষোভ বা রাগ জমতে জমতে এক সময় বিদ্রোহের আকার নেয়। যেমন সাঁওতাল বিদ্রোহ। আর কোনও বিদ্রোহের কারণই হল তার অভ্যুত্থান, অর্থাৎ কোনও কিছুর প্রতিবাদ থেকে বিদ্রোহী হয়ে ওঠা। যেমন পাশ্চাত্য শিক্ষিত মধ্যবিত্তের অভ্যুত্থান। এবার জানা যাক বিপ্লব কথার অর্থ। বি অর্থাৎ বিশেষ আর প্লব মানে লাফ। বিদ্রোহ আর অভ্যুত্থানের গণ্ডি পেরিয়ে বিপ্লবের জন্ম হয়।

চুয়াড় বিদ্রোহ: মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ার কিছু অংশের আদিবাসীদের বলা হতো চুয়াড়, এরাই প্রথম বিদ্রোহ শুরু করে ক্রমে তা ধলভূম, সিংভূম, মানভূম, ঘাটশিলা প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

চুয়াড়দের দাবি ছিল বন ও বন্যসম্পদ রক্ষা করা। ইংরেজরা তাদের জমি কেড়ে নিচ্ছিল, তাই দুর্জন সিংহ-র নেতৃত্বে বিদ্রোহীরা রায়পুরের ৩০টি গ্রাম দখল করে, শালবনির সরকারি অফিস জ্বালিয়ে দেয়। অচল সিংহের নেতৃত্বে বাগিড়ীর লায়েক সম্প্রদায়ের লোকেরা গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ শুরু করে।

এই ভীষণ বিদ্রোহ দমন করার জন্য সরকারকে মেদিনীপুর থেকে পুলিশ আনতে হয়েছিল, শুধু তাই নয় সরকার তাদের মধ্যে ভাঙন ধরাতেও চেয়েছিল, কিন্তু চুয়াড়রা অটুট থেকে তাদের বিদ্রোহ চালিয়ে যায়। পরবর্তীকালে ইংরেজরাও এই বিদ্রোহের যৌক্তিকতা স্বীকার করে সরকারকে এই অবস্থার জন্য দায়ী করে।

রংপুর বিদ্রোহ: প্রজা এবং জমিদাররা ঠিকমতো রাজস্ব দিতে না পারলে ইংরেজরা তাদের উপর অত্যাচার চালাত। এই বিদ্রোহেই শেখ নুরুলুদ্দিন ও ধীরাজরঞ্জনের নেতৃত্বে রংপুরের শাকিনা, ফতেপুর, ডিমলা, কুচবিহার ও দিনাজপুরে রংপুর বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। 'দিংখরচা' বা চাঁদার মাধ্যমে এই বিদ্রোহের খরচ চালানো হতো। এই যুদ্ধে জমিদারের কাছারি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, খাজাঞ্চি লুট করে বন্দি কৃষকদের মুক্ত করা হয়।

কোল বিদ্রোহ: এই আন্দোলনের মূল কারণ ছিল হিন্দু, মুসলিম ও শিখ সম্প্রদায়ের মানুষের জমির ইজারা লাভ ও খাজনা আদায়ের জন্য অত্যাচার। ১৮৩১ সালে এই বিদ্রোহের সূত্রপাত হয় ছোটনাগপুরের ওঁরাও, মুন্ডা, হো সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে। পরে তা ছড়িয়ে পড়ে মানভূম, সিংভূম, রাঁচি, হাজারিবাগ, পালামৌ প্রভৃতি অঞ্চলে। বুদ্ধু ভগত, জোয়া ভগত, সুই মুণ্ডা প্রমুখ ছিল এই বিদ্রোহের নেতা। এই বিদ্রোহের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল গণ অভ্যুত্থান। তারা গ্রামে গ্রামে তির ধনুক বিলি করত আর মহাজনদের হাতে পেলে ঠাকুরের সামনে তাদের বলি দিত। তারা ক্রমেই হিংস্র হয়ে ওঠে।

ইংরেজরা কলকাতা, বেনারস, পটনা থেকে সেনাবাহিনী নিয়ে আসে এই বিদ্রোহ দমনের জন্য। প্রায় ২ বছর এই বিদ্রোহ চলে। পরে ইংরেজদের আধুনিক অস্ত্রের কাছে পরাজিত হয়ে প্রায় ১০,০০০ বিদ্রোহী মারা যায় এবং বিদ্রোহ শেষ হয়। তবে অনেকে মনে করে সুযোগ্য নেতার অভাব, আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতা ও তাদের নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের অভাবও বিফলতার কারণ। তবে সরকারও কিছু কিছু দাবি মেনে নেয় যেমন—দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত এজেন্সি বলে একটি এলাকা কোলদের নামে নির্দিষ্ট করা হয়। কোলদের নিজস্ব দাবি ও আইনকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

সাঁওতাল বিদ্রোহ: চিরস্থায়ী প্রথার পরে যে আন্দোলনগুলো হয়েছিল তাদের মধ্যে সাঁওতাল বিদ্রোহ অন্যতম। মূলত অরণ্যের অধিকার ও 'দামিন-ই-কোহ' বা ঈশ্বরপ্রদত্ত নিষ্কর জমির অধিকার নিয়ে এই বিদ্রোহের সূত্রপাত। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে বিহারের রাজমহল থেকে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত এই বিদ্রোহের ব্যাপ্তি ছিল। এর বিশেষত্ব হল সব শ্রেণির মানুষ মিলে এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করে, তাই অনেকে একে স্বাধীনতা সংগ্রামের সূত্রপাতও বলে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর জমিদার, মহাজন ও ইংরেজরা মিলে সাঁওতালদের ওপর অকথ্য অত্যাচার শুরু করে। তাদের জমি কেড়ে নেয়, রাজস্ব অনাদায়ে ৫০%-৫০০% হারে সুদ নিতে বাধ্য করে মহাজনদের কাছ থেকে, এমনকী মহিলাদের সম্মানও নষ্ট করে। এইসব কারণে সিধু, কানু, চাঁদ ও ভৈরবের নেতৃত্বে ২০,০০০ সাঁওতাল মিলিত ভাবে বিদ্রোহ শুরু করে। লর্ড ডালহৌসির আমলে কঠোর হাতে গণহত্যা চালিয়ে বিদ্রোহ দমন করা হয়।

এই বিদ্রোহ পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে একথা বলা যায় না, কারণ ইংরেজরা সাঁওতালদের জন্য সাঁওতাল পরগনা নির্দিষ্ট করে এবং তারা সাবধান হয় যে অত্যাচারের মাত্রা ছাড়ালে যে কোনও মানুষই বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে।

ক্লাস টেন-এর টিউশন | জীবন বিজ্ঞান

দ্বিসংকর জনন

আগের টিউশনে আমরা একসংকর জনন ও তার সঙ্গে মেন্ডেলের বংশগতি সম্পর্কে জেনেছি। আজ আমরা দ্বিসংকর জনন সম্পর্কে জানব।

মেন্ডেল দ্বিসংকর জননের পরীক্ষায় একটি হলুদ বীজপত্র ও গোলাকার বীজবিশিষ্ট (YYRR) বিশুদ্ধ মটর উদ্ভিদের সঙ্গে একটি সবুজ বীজপত্র ও কুঞ্চিত বীজবিশিষ্ট (yyrr) মটর উদ্ভিদের ইতর পরাগযোগ ঘটান। যেখানে হলুদ বীজপত্র (Y) ও গোলাকার (R) বীজের জন্য দায়ী জিন হল প্রকট এবং সবুজ বীজপত্র (y) ও কুঞ্চিত (r) বীজের জন্য দায়ী জিন হল প্রচ্ছন্ন।

F1 জনুর উদ্ভিদগুলি হলুদ বীজপত্র ও গোলাকৃতি বিশিষ্ট (YyRr)। আবার F1 জনুর উদ্ভিদগুলির মধ্যে স্বপরাগযোগ ঘটিয়ে F2 জনুতে ৯/১৬ অংশ হলুদ ও গোলাকার, ৩/১৬ অংশ হলুদ ও কুঞ্চিত, ৩/১৬ অংশ সবুজ ও গোলাকার ও ১/১৬ অংশ সবুজ ও কুঞ্চিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন উদ্ভিদ সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ মেন্ডেলের দ্বিসংকর জননের পরীক্ষায় F2 জনুতে ফিনোটাইপিক অনুপাত ৯:৩:৩:১ এবং জিনোটাইপিক অনুপাত ১:২:২:৪:১:২:১:২:১। এই পরীক্ষার ফলাফল থেকেই মেন্ডেল স্বাধীন বিন্যাসের সূত্রটির উদ্ভাবন করেন।

স্বাধীন বিন্যাসের সূত্র: দুই বা ততোধিক জোড়া পরস্পর বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বিশুদ্ধ জীবের মধ্যে সংকরায়ণ ঘটালে অপত্য জনুতে ওই বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী জিনগুলি একত্রিত হলেও তারা কখনও মিশ্রিত হয় না, উপরন্তু পরবর্তীকালে গ্যামেট গঠনের সময় প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য অপর বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে স্বাধীনভাবে সম্ভাব্য সকলপ্রকার সমন্বয়ে সঞ্চারিত হয়।

প্রাণীদের উপর দ্বিসংকর জননের পরীক্ষা: একটি কালো (B) ও কর্কশ (R) লোমবিশিষ্ট গিনিপিগের সাথে সাদা (b) ও মসৃণ (r) লোমবিশিষ্ট গিনিপিগের সংকরায়নে কালো বর্ণ (B) ও কর্কশ (R) লোমের জন্য দায়ী জিনগুলি প্রকট এবং সাদা বর্ণ (b) ও মসৃণ (r) লোমের জন্য দায়ী জিনগুলি প্রচ্ছন্ন। F1 জনুর সবকটি গিনিপিগ কালো ও কর্কশ লোমবিশিষ্ট হয়। F1 জনুতে সৃষ্ট একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রীর মধ্যে সংকরায়ণের ফলে সৃষ্ট F2 জনুতে কালো ও কর্কশ, কালো ও মসৃণ, সাদা ও কর্কশ, সাদা ও মসৃণ লোমবিশিষ্ট গিনিপিগের ফিনোটাইপিক অনুপাত ৯:৩:৩:১। F2 জনুতে জিনোটাইপিক অনুপাত ১:২:২:৪:১:২:১:২:১।

মেন্ডেল মটর উদ্ভিদ নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন কারণ—

ক) মটর উদ্ভিদের স্বল্প জীবনকালে একাধিক জনুর উপর পরীক্ষা সম্পন্ন করে ফলাফল জানা সম্ভব।

খ) মটর উদ্ভিদে একাধিক পরস্পর বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি।

গ) মটর ফুল উভলিঙ্গ, তাই স্বপরাগযোগ বা রেসিপ্রোকাল ক্রস করা সুবিধাজনক।

ঘ) মটর উদ্ভিদ বংশপরম্পরায় নির্দিষ্ট চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বিশুদ্ধ অপত্য উৎপাদনে সক্ষম।

ঙ) মটর উদ্ভিদের সংকর জীব প্রজননক্ষম, তাই পরবর্তী প্রজন্মের উপর পরীক্ষা সম্ভব।

চ) মটর ফুল বড়, তাই ইমাসকুলেশন করা সহজ।

ছ) মটর উদ্ভিদ স্বপরাগযোগী, তাই বাইরের অবাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্য মিশে যাবার সম্ভবনা কম।

ব্যাকক্রস ও টেস্টক্রস: কোনও সংকর জীবের সঙ্গে ওই জীবের পিতৃ-মাতৃ জনুর জীবের ক্রসকে ব্যাকক্রস বলে। F1 জনুর অপত্যের সঙ্গে প্রচ্ছন্ন জনিতৃর সংকরায়ণকে টেস্টক্রস বলে।

মেন্ডেলের বংশগতি সূত্রের বিচ্যুতি:

সব সময় মেন্ডেলের প্রকট প্রচ্ছন্নতার তত্ত্ব জীবের বংশগতিতে সত্যি বলে প্রমাণ হয় না। তখন তাকে মেন্ডেলের

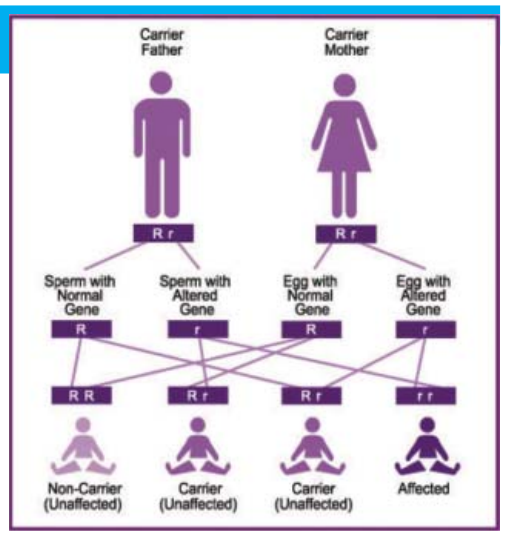

সূত্রের বিচ্যুতি বলে।

পরস্পর বিপরীত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দুটি বিশুদ্ধ জীবের মধ্যে সংকরায়ণের ফলে সৃষ্ট অপত্য সংকর জীবে যখন প্রকট জিনটি তাঁর ফিনোটাইপ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে পারে না এবং জীবে প্রকট ও প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যর মধ্যবর্তী একটি মিশ্র ফিনোটাইপের প্রকাশ ঘটে, তখন প্রকট জিনটির ওই ধর্মকে অসম্পূর্ণ প্রকটতা বলে।

বিজ্ঞানী ক্লোরেন্স একটি লাল ফুলযুক্ত (RR) ও আরেকটি সাদা ফুলযুক্ত (rr) সন্ধ্যামালতি উদ্ভিদের মধ্যে সংকরায়ণ ঘটিয়ে F1 জনুতে সমস্ত গোলাপি (Rr) ফুলযুক্ত উদ্ভিদ পান। F1 জনুতে উৎপন্ন গোলাপি ফুলযুক্ত উদ্ভিদের স্বপরাগযোগ ঘটালে F2 জনুতে উৎপন্ন উদ্ভিদগুলির ফিনোটাইপিক অনুপাত হয় লাল (RR): গোলাপি (Rr):সাদা (rr) = ১:২:১। F2 জনুতে মেন্ডেলের পরীক্ষায় জিনোটাইপিক অনুপাত ছিল ১:২:১, কিন্তু এক্ষেত্রে F2 জনুতে ফিনোটাইপিক অনুপাত হল ১:২:১। আবার সন্ধ্যামালতি উদ্ভিদে F1 জনুতে সৃষ্ট সংকর উদ্ভিদে জনিতৃ জনুর কোনও ফিনোটাইপই সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়নি, তাই একে বংশগতির সূত্রের বিচ্যুতি বলে।

বাংলায় লেখার জন্য কি-বোর্ড প্র্যাকটিস

বাংলা টাইপিং বা লেখার জন্য সাধারণত আলাদা সফটওয়্যার কম্পিউটারে ইনস্টল করে নিতে হয়। বর্তমানে বাজারে অনেক ধরনের বাংলায় টাইপ করার সফটওয়্যার পাওয়া যায়। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ও অপেক্ষাকৃত সহজ কি-লেআউট হচ্ছে বিজয় কি-লেআউট। বিজয় কি-বোর্ড লেআউটে টাইপ করা যেমন সহজ, তেমনি বাংলার বিভিন্ন যুক্ত অক্ষর টাইপ করাও অনেক সোজা। বাংলায় লেখালিখির আগে এই সফটওয়্যারটি কম্পিউটারে ইনস্টল করে নিতে হবে। তাহলেই চাহিদামাফিক বাংলা টাইপ করা সম্ভব হবে। এবার কাজের কথায় আসা যাক।

বাংলা টাইপ প্র্যাকটিস করার আগে যেমন বাংলা কি-লেআউট সফটওয়্যার ইনস্টল করার দরকার হয় তেমনি বাংলা ফন্টও ইনস্টল করার দরকার হয়। বিজয় সফটওয়্যার ইনস্টল করা থাকলে ইংরেজি কি-বোর্ড দ্বারাও বাংলা টাইপ করা যায়। তাই বাংলা টাইপ শুরু করার আগে কম্পিউটারের ফন্ট বক্স থেকে দেখে নিতে হবে বাংলা অক্ষর বা ফন্ট ইনস্টল করা আছে কিনা। অধিক ব্যবহৃত কয়েকটি বাংলা ফন্ট, যেমন, SutonnyII, SutonnyMJ, SulekhaT, ইত্যাদি। ধরা যাক, আমাদের কম্পিউটারে সবকিছু ঠিকমতো দেওয়া আছে। বাংলা লেখা শুরু করার জন্য যা করতে হবে:

১) প্রথমে কম্পিউটার ওপেন করে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ওপেন করতে হবে।

২) ফন্টবক্স বক্স থেকে SutonnyMJ ফন্টটি নির্বাচন করতে হবে।

৩) সাইজ বক্স থেকে ফন্ট সাইজ ২৬ পয়েন্ট সিলেক্ট করলে দেখতে এবং পড়তে সুবিধা হবে।

৪) এবার কি-বোর্ড থেকে কন্টোল(ctrl)-কি চেপে ধরে s অক্ষরটি চেপে 'bangla type testing' নামের একটা ফাইল সেভ করতে হবে। অর্থাৎ Ctrl+S

৫) এবার কি-বোর্ড থেকে 'সিটিআরএল' এবং 'এএলটি' কি-দুটো চেপে ধরে 'বি' অক্ষরটি চেপতে হবে। অর্থাৎ Ctrl+Alt+B।

ইংরেজি থেকে বাংলা কি-লেআউটে যেতে এবং বাংলা থেকে ইংরেজি কি-লেআউটে যেতে এই কাজটি করতে হবে। অর্থাৎ বাংলা লেখার মাঝে কোনও কিছু ইংরেজিতে অথবা ইংরেজি লিখতে লিখতে বাংলায় লেখার দরকার হলে Ctrl+Alt+B কম্যান্ডটি ব্যবহার করতে হবে। যতবার ইংরেজি থেকে বাংলা এবং বাংলা থেকে ইংরেজি লেখার দরকার হবে ততবারই একাজটি করতে হবে।

প্রথম পাঠ: ইংরেজি টাইপ করার মত হাত দুটো কি-বোর্ডের যথাস্থানে যথানিয়মে আলতোভাবে রাখতে হবে। এরপর মাঝখানের লাইন থেকে শুরু করতে হবে। অর্থাৎ কি-বোর্ডের যে লাইনে (ASDFG) লেখা আছে। আগের মতো একই নিয়মে কি-গুলোকে পরিচালনা করতে হবে তবে প্রতিটি অক্ষরের মাঝে তিনটি করে স্পেস দিতে হবে। প্রথমে বাঁ হাতের অংশ এবং তারপর ডান হাতের অংশ এক এক করে টাইপ করতে হবে। নীচের অনুশীলনটি কমপক্ষে ১০০ বার টাইপ করতে হবে।

বাঁ হাতের অংশ: ৃ ু ি া ্

ডান হাতের অংশঃ ; দ ত ক ব

এন্টার-কি চেপে নীচের লাইনে যেতে হবে এভাবে কমপক্ষে ১০০ বার অনুশীলনটি টাইপ করতে হবে।

এরপর প্রতিটি শব্দের পর একটি করে স্পেস দিয়ে নিচের অনুশীলনটি কমপক্ষে ১০ বার টাইপ করতে হবে।

দাদা; কাকা; বাবা; দিদি; কাতুকুতু; বিবি; কৃতি;

দ্বিতীয় পাঠ: (শিফট' কী ব্যবহার)

প্রথম পাঠের মতো একই নিয়মে কি-গুলোকে পরিচালনা করতে হবে তবে Shift-কি ব্যবহার করে অর্থাৎ কি-বোর্ডের শিফট-কি চেপে ধরে প্রতিটি অক্ষর টাইপ করতে হবে এবং প্রতিটি অক্ষরের মাঝে স্পেস দিতে হবে। প্রথমে ডান হাতের কনিষ্ঠ আঙুল দিয়ে Shift-কি চেপে ধরে বাঁ হাতের অংশ এবং তারপর বাঁ হাতের কনিষ্ঠ আঙুল দিয়ে Shift-কি চেপে ধরে ডান হাতের অংশ এক এক করে টাইপ করতে হবে। নিচের অনুশীলনটি কমপক্ষে ১০০ বার টাইপ করতে হবে।

বামহাতের অংশ: র্ ্র ী অ ।

ডানহাতের অংশ: : ধ থ খ ভ

এন্টার-কি চেপে নীচের লাইনে যেতে হবে এভাবে কমপক্ষে ১০০ বার অনুশীলনটি টাইপ করতে হবে।

এরপর প্রতিটি শব্দের পর একটি করে স্পেস দিয়ে নীচের অনুশীলনটি কমপক্ষে ১০ বার টাইপ করতে হবে।

অধিক; কথা; অবাক; কর্তা; তীর্থ; দাতা; ভীত;

তৃতীয় পাঠ: এরপর উপরের লাইন থেকে শুরু করতে হবে। অর্থাৎ কি-বোর্ডের যে লাইনে (QWERT) লেখা আছে। আগের মতো একই নিয়মে কি-গুলোকে পরিচালনা করতে হবে এবং প্রতিটি অক্ষরের মাঝে তিনটি করে স্পেস দিতে হবে। প্রথমে বাঁ হাতের অংশ এবং তারপর ডান হাতের অংশ এক-এক করে টাইপ করতে হবে। নিচের অনুশীলনটি কমপক্ষে ১০০ বার টাইপ করতে হবে।

বাঁ হাতের অংশ: ঙ য ড প ট

ডান হাতের অংশ: ড় গ হ জ চ

এন্টার-কি চেপে নিচের লাইনে যেতে হবে এভাবে কমপক্ষে ১০০ বার অনুশীলনটি টাইপ করতে হবে।

এরপর প্রতিটি শব্দের পর একটি করে স্পেস দিয়ে নীচের অনুশীলনটি কমপক্ষে ১০ বার টাইপ করতে হবে।

পড়তি; ভাঙা; জড়পদার্থ; অপদার্থ; অবিকৃত; গড়; যথাযথ; ডাবু; টুকিটাকি; হাতাহাতি; চাপাবাজি

এরপর আগামী সপ্তাহে

পরীক্ষার খাতার খুঁটিনাটি

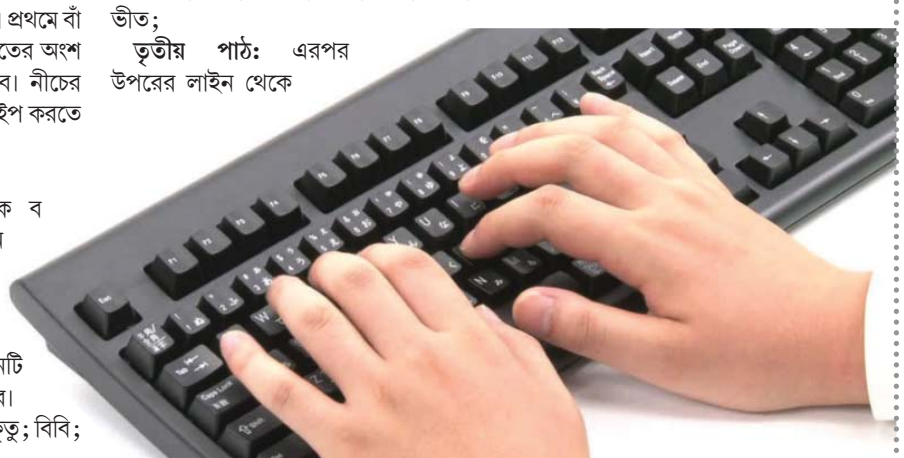

সারা বছরে যা কিছু পড়া বা শেখা হয় তার প্রতিফলন বা মূল্যায়ন পরীক্ষার খাতার মধ্যে দিয়ে হয়। নিজের যা কিছু জানা আছে তা যদি ঠিকভাবে প্রকাশ না করা যায়, তাহলে নম্বর আদায়ের সুযোগ কমে যায়। অনেকের কাছেই তাই এই পরীক্ষার খাতা আতঙ্কের বিষয়। কিন্তু আসলে তা একেবারেই নয়। প্রথমত ভয় পেয়ো না। ভয়ে সব কিছু ভেস্তে যেতে পারে। উত্তর তো ভুল হতেই পারে তার সঙ্গে বানান ভুল, কাটাকুটি, খাতা নোংরা হওয়া ইত্যাদি সমস্যাও তৈরি হবে। কিন্তু এগুলো কোনওটাই তো কাম্য নয়। তাই সারাবছর পড়াশোনার প্রতি যেমন যত্নশীল হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি পরীক্ষার সময়ে খাতার প্রতিও যত্নশীল হওয়ার প্রয়োজন আছে।

প্রথমেই খেয়াল রাখতে হবে যে নিজের পরিচয়টা গুছিয়ে সঠিকভাবে লিখতে হবে। অ্যাডমিট কার্ডের প্রতিটা সংখ্যা বা অক্ষর দেখে তোলার সময় খুব মনসংযোগের সঙ্গে করতে হবে। অনেকে অ্যাডমিট কার্ডটাও আগে থেকে চোখ বুলিয়ে রাখেন যাতে শুরুর এই কাজটা ঝটপট সেরে ফেলা যায়। এ'সব কিছুই পরিষ্কার আর গোটা গোটা হরফে লিখতে হবে। পুরো খাতাতেই এই হাতের লেখা ধরে রাখতে হবে। হাতের লেখা সকলেরই খুব ঝকঝকে, আঁকার মতো হয় না। কিন্তু তা যেন সুস্পষ্ট হয়।

খাতাতে মার্জিন খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। চারিদিকে পর্যাপ্ত খালি জায়গা ছাড়া উচিত। স্কেল, পেনসিল দিয়ে দাগ না টানতে পারলে খাতা ভাঁজ করে প্রত্যেক পাতায় সমান মার্জিন রাখা উচিত। এই খালি জায়গার প্রয়োজনীয়তা আছে। এখানে প্রথমত প্রশ্নের নম্বর লিখতে হয়, পরীক্ষকরা প্রয়োজনীয় নম্বর বা মন্তব্য লেখার জন্যে এই খালি জায়গার ব্যবহার করেন। আর খাতা বাঁধার ফলে যে খাতা মুড়ে যায় তার জন্যেও এই খালি জায়গা দরকারি। একেবারে খাতার কোনা থেকে লিখলে লেখা ভাঁজের মধ্যে ঢুকে যাবে। ফলে খাতা দেখতে অসুবিধা হবে।

প্রশ্নের নম্বর লেখা একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সবাই সাধারণত খাতার এক পাশে মার্জিনে নম্বর লেখে। কিন্তু এই নম্বর লেখার ধরনটা একটু পাল্টালে ভালোই হয়। যেমন, একপাশের বদলে নম্বর যদি উত্তর শুরুর আগে খাতার মাঝে একটা বাক্স করে লেখা যায় তো তা খাতার ভাঁজের আড়ালে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। আবার পরীক্ষকদেরও খাতা দেখার সময় কোনও প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

প্রতিটা আলাদা প্রশ্নের মধ্যেও একটা ফাঁকা জায়গা রাখা উচিত। যাতে প্রশ্নগুলোকে একে অপরের থেকে আলাদা করা যায়। MCQ-র উত্তর দেওয়ার সময় পূর্ণ বাক্যে উত্তর দিলে ভালো হয়। প্রতিটা উত্তর যেন আলাদা করে বোঝা যায়। প্রয়োজনে উত্তর শেষে একটা দাগ ছোট করে টেনে দেওয়া যেতে পারে।

কোনও কিছু আঁকার সময় বা গ্রাফের কাজ করার সময়ে পেনসিল খুব তীক্ষ্ণ হওয়া দরকার। একবারে সঠিক উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে, যাতে মোছামুছির ফলে খাতা নোংরা না হয়ে যায়। সঠিক লেবেলিং একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি খুব সূক্ষ্মতার সঙ্গে করা দরকার। স্কেল, কম্পাস যা কিছু উপকরণের ব্যবহার করা যায় তা করে ছবি বা গ্রাফকে পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন আর নিখুঁত করতে হবে।

গ্রাফ পেপারে কোনও উত্তর দেওয়ার সময়ে স্কেল নির্বাচন প্রথমে সঠিক হওয়া দরকার। এক্ষেত্রে অনেকে গ্রাফ পেপারে অংকিত স্কেল ধরেই উত্তর দেন। অনুভূমিক ও উল্লম্ব স্কেলকে প্রশ্ন পড়ে সঠিকভাবে ভাগ করে নিতে হবে। এর ফলে পুরো উত্তর গোটা গ্রাফ পেপার জুড়ে হবে। না হলে ছবিটা পাতার এক কোনায় পড়ে থাকবে। যা দেখতে মোটেই ভালো লাগে না। তাতে উত্তরের স্পষ্টতা আসে না। একই ভাবে সম্পাদ্য, উপপাদ্যেও এই যত্ন নেওয়া প্রয়োজন।

ভূগোলের ক্ষেত্রে ম্যাপ পয়েন্টিং আগে থেকে বারে বারে অভ্যেস করতে হবে। এগুলো খাতায় করার সময়ে যেন একদম সঠিক হয়। গোটা ম্যাপটা যেন চোখে ভাসে। কোনও ভাবেই ভুল না হয়।

পরীক্ষার খাতায় দুটো রঙের কালির পেন (সাধারণত কালো আর নীল) ব্যবহার করা যায়। হাইলাইট করলে খাতা যেমন দেখতে সুন্দর লাগে তেমনি স্পষ্টতা বাড়ে।

এসব কিছুর ওপরে হল প্রশ্ন নির্বাচন। যে-প্রশ্নের উত্তরের জটিলতা ছাত্রছাত্রীর কাছে কম বা ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম সেগুলোয় জোর দিতে হবে। যে-প্রশ্নের উত্তর বিশ্লেষণধর্মী তাতে নম্বর কাটার কিছু সম্ভাবনা থাকতে পারে। যেসব ক্ষেত্রে প্রশ্নের মধ্যে বিভাজন থাকে তার সবকটি উত্তর দিতে পারলে বেশি নম্বর স্কোর করা যায়।

সবশেষে বলা যায় যে সময়কে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে, যাতে খাতার মান শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একই থাকে। হাতের লেখা ও লেখার মান একরকম ধরে রাখতে হবে।

দীপককুমার বোস, শিক্ষক

তরঙ্গ
যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ২৭ ডিসেম্বর ২০১৬

স্মরণীয় যাঁরা

(২৭ ডিসেম্বর - ২ জানুয়ারি)

শিশুসাহিত্যিক ও স্বাধীনতা সংগ্রামী **খগেন্দ্রনাথ মিত্র**

(**জন্ম:** ২ জানুয়ারি ১৮৯৬, মৃত্যু: ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮)

১৯৪৮ সালে প্রকাশ করেন এশিয়ার সর্বপ্রথম দৈনিক শিশুসাহিত্য পত্রিকা 'কিশোর'। শতাধিক বই লিখেছেন ছোটদের জন্য। লিখেছেন 'ভারতবর্ষ', 'প্রবাসী', 'মহিলা' প্রভৃতি পত্রিকায়। তাঁর লেখা 'ভোম্বল সর্দার' বইটি হিন্দি ও রুশ ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। ব্যালেন্টাইনের বিখ্যাত বই 'গোরিলা হান্টার' অবলম্বনে লেখেন 'আফ্রিকার জঙ্গলে'। অনুবাদ করেছেন 'বেন হুর', 'লাস্ট ডেজ অব পম্পেই', 'ব্ল্যাক অ্যারো'। বড়দের জন্যেও লিখেছেন 'গড় জঙ্গলের কাহিনী', 'ঠাকুরদার বুনো গল্প', 'ডাকাতের ডুলি', 'গণেশচন্দ্রের অশুভ যাত্রা' ইত্যাদি। তাঁর কিছু রচনা— 'মৌটুসকি', 'সেই ছোকরাটা', 'কপালের লেখা', 'স্বপ্নে পাওয়া গল্প', 'কর্তাবাবুর পেত্নী দেখা', 'মিন্টুর ছবি' ইত্যাদি নানান গল্প।

উত্তরণ

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ২৭ ডিসেম্বর ২০১৬

স্মরণীয় যাঁরা
(২৭ ডিসেম্বর - ২ জানুয়ারি)

সাহিত্যিক এবং চলচ্চিত্র পরিচালক **শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়** (জন্ম: মার্চ ১৯০১, **মৃত্যু: ২ জানুয়ারি ১৯৭৬**)

বর্ধমান জেলার অন্ডাল গ্রামে তাঁর জন্ম। স্কুল জীবনে দুই বন্ধু, শৈলজানন্দ লিখতেন পদ্য আর নজরুল লিখতেন গদ্য। বাঁশরী পত্রিকায় তাঁর রচিত 'আত্মঘাতীর ডায়েরি' প্রকাশিত হলে দাদামশাই তাঁকে আশ্রয় থেকে বিদায় দেন। পরে তিনি কয়লা কুঠিতে চাকরি নেন। এই সময় একের পর এক স্মরণীয় গল্প লেখেন।

আগামিকাল বি না মূ ল্যে

উত্তরণ 'হেল্‌থ টিপস'

মস্তিষ্কের শক্তি বৃদ্ধিতে খাদ্যের ভূমিকা

সব অভিভাবকই নিজের শিশুর উন্নতি চান। পড়াশোনা, খেলাধুলো, নাচ-গান ইত্যাদি সবকিছুতেই সন্তানের পারদর্শিতা কামনা করেন অভিভাবকরা। তবে এর জন্য শিশুর মস্তিষ্কের শক্তি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। তাই শিশুর দৈনিক খাবারের উপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। শিশুটি দৈনিক প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাবার খাচ্ছে কি না, সেদিকে নজর রাখুন। লিখছেন **মিলন সরকার**।

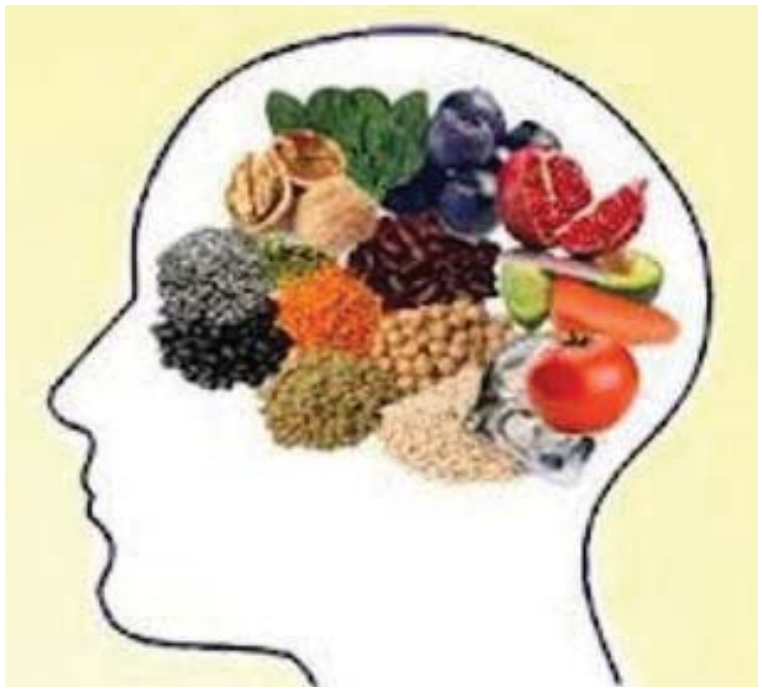

শিশুদের জন্য ১০টি সুপার ব্রেন ফুড

মানুষের মগজের ওজন দেহের মোট ওজনের মাত্র দুই শতাংশ হয়। মগজের সঠিকভাবে কাজ করতে হলে খাদ্য থেকে লাভ করা মোট ক্যালোরির ২০ শতাংশ ক্যালোরি প্রয়োজন হয়। তার পাশাপাশি এটি কর্মক্ষম হয়ে থাকতে হলে নিয়মিতভাবে গ্লুকোজের প্রয়োজন হয়। মোট কথা, মগজের ঠিকমতো কাজ করতে হলে সঠিক পরিমাণের পুষ্টিকর আহারের দরকার।

গবেষকরা ইতিমধ্যেই প্রমাণ পেয়েছেন যে, উপযুক্ত পুষ্টি না পাওয়ায় একটি মগজ অ্যাকাডেমিক বিষয়ে কখনও সঠিকভাবে কাজ করতে পারে না। অন্যদিকে বেশির ভাগ শিশুই উপযুক্ত পুষ্টিহীনতার ফলে শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকে। সাধারণত দেখা যায় যে স্কুলে যাওয়ার আগে মায়েরা শিশুদের দুধ বা ব্রেকফাস্ট দেন। কখনও আবার টিফিনে দেওয়া খাবার শিশু বাড়ি ফেরত নিয়ে আসে। তাই শিশু যেন খাবার সঠিকভাবে খায়, তার উপর নজর রাখা উচিত। শিশুর শারীরিক বিকাশের জন্য পুষ্টিকর আহার খাওয়ানো উচিত। সম্প্রতি এ-সম্পর্কে গবেষকরা জানিয়েছেন, খাবার খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মগজ প্রথমেই পুষ্টি উপাদান শুষে নেয়। এ ক্ষেত্রে কিছু ব্রেইন-ফুড শিশুদের খাওয়ালে মগজের বিকাশ হয়। এতে মগজের কর্মকুশলতা, স্মৃতিশক্তি, মনোসংযোগ ইত্যাদি ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

১০টি সুপার ব্রেইন ফুড

স্যামন মাছ: এই প্রজাতির মাছে ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড, ডিএইচএ এবং ইপিএ থাকে। মগজের বিকাশ এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধি জন্য এই কটি উপাদান খুবই জরুরি। যে সমস্ত শিশু সপ্তাহে দু'দিন স্যামন মাছ খায়, তাদের মগজ খুবই তীক্ষ্ণ হয়। এছাড়া টুনা এবং ম্যাকারেল নামের সামুদ্রিক মাছগুলিতেও যথেষ্ট পরিমাণে ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে।

ডিম: ডিমে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন পাওয়া যায়। ডিমের কুসুমে কোলাইন নামের উপাদান থাকে। এই উপাদানটি মগজের বিকাশের জন্য অতি প্রয়োজনীয়। শিশুদের ব্রেকফাস্ট বা দুপুরের খাবারে ডিম খেতে দেওয়া উচিত।

চিনাবাদাম: চিনাবাদাম তথা চিনাবাদাম থেকে প্রস্তুত করা মাখনে ভিটামিন ই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এটিতে থিয়ামাইন নামের আরেক উপাদান থাকে, যা মগজের শক্তি বাড়ায় এবং স্নায়ুতন্ত্র গ্লুকোজগুলি শক্তিতে রূপান্তর করতে সাহায্য করে। এছাড়া ছোট ছোট টুকরো করা চিনাবাদাম স্যালাড, আইসক্রিম বা ফলমূলের সঙ্গে শিশুদের খেতে দিতে পারেন। স্যান্ডউইচ বা কলার সঙ্গেও শিশুদের দিতে পারেন এই বাদাম।

হোল গ্রেইন: সারাদিন ঠিকমতো কাজ করার জন্য মগজের নির্দিষ্ট পরিমাণের গ্লুকোজের প্রয়োজন হয়। এই গ্লুকোজ হোল গ্রেইনে পাওয়া যায়। এর আঁশ নিয়মিত গ্লুকোজ সরবারহ করে। এছাড়া এর ভিটামিন বি উপাদানটি শিশুদের স্নায়ুতন্ত্র শক্তিশালী করে তোলে।

ওটস: সাধারণত জই বা ওটসকে বলা হয় গেইন ফর দ্য ব্রেইন। ব্রেকফাস্টের সময় শিশুদের জই থেকে তৈরি খাবার খেতে দিলে মগজের শক্তি বাড়ে। আঁশযুক্ত জই খাওয়ালে শিশুরা গোটা দিন এনার্জি পায়। ওটসে ভিটামিন বি, ই, পটাসিয়াম এবং জিংক ইত্যাদি উপাদান থাকে। এই উপাদানগুলি শিশুর মগজ ও শরীরে শক্তি প্রদান করে।

বেরিজ: স্ট্রবেরি, ব্লুবেরি, চেরি ইত্যাদিতে শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে। এর রং যত গাঢ় হয়, পুষ্টিগুণ ততই বেশি হয়। এ ধরনের ফলে ভিটামিন সি থাকে। এই ভিটামিন ক্যানসার রোগ প্রতিরোধ করে। শিশুদের স্মৃতিশক্তি বাড়াতে হলে নিয়মিত এ-ধরনের ফল খাওয়া উচিত। ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডও এ ধরনের ফলে পাওয়া যায়।

বিনস: বিন হল অতি উত্তম ব্রেইন ফুড। বিন চিন্তা করতে পারার শক্তি সরবরাহ করে। বিনে ভিটামিন, খনিজ দ্রব্য, প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেড ইত্যাদি পাওয়া যায়।

সবুজ শাক-সবজি: সবুজ শাক-সবজিতে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, প্রয়োজনীয় ভিটামিন এবং খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়। অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট মগজের কোষগুলি শক্তিশালী করে তোলা সহ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এছাড়া ভিটামিন ও খনিজ দ্রব্য শরীরের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে। অন্যদিকে যে কোনও ধরনের আঁশযুক্ত সবজি শিশুর কোষ্ঠ পরিষ্কার করে। সবুজ শাক-সবজি শিশুদের যে কোনও প্রকারেই খাওয়ানো যায়।

দুধ ও দই: মগজের পেশি, এনজাইম, নিউরোট্রান্সমিটারের বিকাশের জন্য প্রোটিন ও ভিটামিন বি খুবই প্রয়োজন। দুধ ও দইয়ে প্রোটিন ও কার্বোহাইড্রেট থাকে। তাই শিশুদের দুধ ও দই খাওয়ানো উচিত।

জিংক ও খনিজ দ্রব্য থাকা মাংস: জিংক তথা খনিজ দ্রব্য থাকা মাংস শিশুদের খেতে দিন। শিশুর বিকাশের জন্য খনিজ দ্রব্য খুবই প্রয়োজন। অন্যদিকে জিংক থাকা মাংস খেলে স্মৃতিশক্তি বাড়ে। যে সমস্ত শিশুরা মাংস খেতে চায় না, তাদের সোয়া এবং ব্ল্যাকবিন খাওয়াতে পারেন।

কী ধরনের খাবারে শিশুর মগজ শক্তিশালী হয়?

শিশুরা সাধারণত ফল খেতে ভালবাসে। কিন্তু ফল-মূল শাক-সবজির সঙ্গে মগজের শক্তি বৃদ্ধির জন্য শিশুদের বিশেষ আহারেরও প্রয়োজন হয়।

তিসি: তিসি খেলে মগজের শক্তি বাড়ে। আজকাল প্যাকেটে তিসি পাওয়া যায়। এটি ঠান্ডা জায়গায় রাখতে হয়। প্রতিদিন দু' টেবিল চামচ তিসি শিশুদের খাওয়ালে মগজের শক্তি বৃদ্ধি হয়।

সয়াসিড: দিনে দু' টেবিল চামচ সয়াসিড শিশুদের খেতে দিলে, শিশুরা অধিক পুষ্টি লাভ করে এবং এটি মগজের কোষগুলির মধ্যে যোগাযোগ বাড়াতে সাহায্য করে। সয়াসিড স্যুপ, স্যালাড, দুধ, স্যান্ডউইচ ইত্যাদির সঙ্গে শিশুদের খাওয়ানো যায়।

অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট: ভিটামিন সি এবং ই খেলে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি শিশুর কাজকর্ম পরিপাটি করে করার মানসিকতা বৃদ্ধি করে। শিশুর মগজের শক্তি পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকলে পরিবেশের যে কোনও জটিলতা ও পড়াশোনার চাপ ইত্যাদির সঙ্গে নিজেকে সহজেই খাপ খাইয়ে নিতে পারে। একটি স্বাস্থ্যবান শিশু সাধারণত যে কোনও ধরনের মানসিক চাপমুক্ত থাকে।

খনিজ লবণ: খনিজ লবণ থাকা খাবার খেতে দিলে শিশুদের মানসিক তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে শিশুরা ক্লান্ত কম হয়। এছাড়া শিশুদের সবুজ শাক-সবজি, বজরা, জোয়ার, তিল, সূর্যমুখী ফুলের তেল ইত্যাদি খেতে দিন।

আখরোট: প্রতিদিন শিশুদের তিন থেকে চারটি আখরোট খাওয়ানো উচিত। এগুলিতে ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে। এতে শিশুদের মগজের শক্তি বৃদ্ধি হয়।

শরীরচর্চা ও শিক্ষা

প্রথম পাতার পর

এতে ছেলেমেয়ের মস্তিষ্ক সচল হয়ে ওঠে। বেড়ে যায় আত্মবিশ্বাস। ফলে পুঁথিগত শিক্ষায় আপনাআপনি ভালো হয়ে ওঠে।

অথচ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় জোর দিতে গিয়ে অধিকাংশ সময়ে শারীরিক শিক্ষা বিষয়টি অবহেলিত হয়। ফলে স্কুলগামী বাচ্চাদের মধ্যে স্থূলতার হার বেড়েই চলছে। তার থেকে ছোট বয়সেই ডায়াবেটিস, থাইরয়েডের মতো রোগের প্রকোপ বাড়ছে। অন্যদিকে খেলাধুলায় শরীরের ভারসাম্য বজায় থাকার সঙ্গে হার-জিত এসব লেগেই থাকে। ফলে মনের আবেগ, অভিমান, ইগো— এগুলো যে এখন ছোটদের মধ্যে এত অনিয়ন্ত্রিত, তাও খেলাধুলো নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। শরীরের রোগের সঙ্গে সঙ্গে হতাশাও আজ ছোটদের মধ্যে মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়ছে। সবসময় নিছক ভাবাবেগ দ্বারা পরিচালিত হওয়া, সামাজিক ক্রিয়াকলাপে বিমুখ বা সাধারণ বিষয়ে ভাবাবেগে বিচলিত হয়ে পড়া, একাকীত্বে-হীনম্মন্যতায় আক্রান্ত শৈশব এখন ঘরে ঘরে। এর মোকাবিলার জন্যে শারীরিক শিক্ষা পদ্ধতিকে Extra curricular, Co-curricular-এর গন্ডি ছাড়িয়ে Curriculum-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। একজন শরীরচর্চা শিক্ষক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। তিনি প্রতিষ্ঠানের সমস্ত শিক্ষার্থীর কাছে অতি পরিচিত, সদালাপী এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একজন বন্ধুরূপী শিক্ষক। শিক্ষার্থীরা তাদের ব্যক্তিগত অনেক সুবিধা-অসুবিধার কথা তাঁর কাছে নির্ভয়ে তুলে ধরতে পারে যা অনেকসময় অন্যান্য শিক্ষকের কাছে অকপটে বলতে দ্বিধাবোধ করে। একজন শরীরচর্চা শিক্ষক অ্যাসেম্বলি, খেলাধুলো, স্কাউটিং ইত্যাদি দ্বারা দেশের সংকটকালে প্রয়োজনীয় ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলেন।

তাই মাঠ হোক, বাড়ির ছাদ, উঠোন যাই হোক বা খোলা জায়গা, খেলাধুলোকে রোজকার রুটিনের মধ্যে রাখা উচিত। ক্রিকেট, ফুটবল, সাঁতার যাই হোক, না হলে নিছক ছুটোছুটি করে যা খেলে আনন্দ পাওয়া যায় তা-ও করা যায়। এছাড়া ব্যায়াম, প্রাণায়াম ইত্যাদিও ছোটদের উপকার করে।

যুগশঙ্খ SUPPLI | পরিকল্পনা ও সম্পাদনা: **বিপ্লব রায়** | 'উত্তরণ' ক্রোড়পত্রটি আপনাদের কেমন লাগছে jugasankha.suppli@gmail.com আইডি-তে মেল করে জানান।